অক্ষরাঞ্জলি

শারদোৎসব ১৪২৭

সঙ্কলন:পাণ্ডুলিপি

প্রথম প্রকাশঃ ২০শে অক্টোবর, ২০২০

প্রচ্ছদ ও অন্তিম পৃষ্ঠার চিত্রঃ গৌতম বোস

অন্যান্য চিত্র সমূহঃ

পৃষ্ঠা ১০: Photo by Alireza Tabar esfahani from Pexels
পৃষ্ঠা ১৫: Photo by Vladislav Reshetnyak from Pexels
পৃষ্ঠা ১৭: Photo by Frank Cone from Pexels
পৃষ্ঠা ৩০: Photo by Tatiana from Pexels
পৃষ্ঠা ৩১: Photo by Mauricioliveira109 from Pexels
পৃষ্ঠা ৩৯: Photo by Danang Wicaksono from Pexels
পৃষ্ঠা ৪১: Photo by Arantxa Treva from Pexels
Page ৪৯: Photo by nappy from Pexels
পৃষ্ঠা ৬৫: Photo by Jonathan Borba from Pexels
পৃষ্ঠা ৭১: Photo by Daria Sannikova from Pexels
পৃষ্ঠা ৭৩: https://www.pexels.com/photo/owl-butterfly-on-human-finger-160729/
পৃষ্ঠা ৮০: Photo by Nika Akin from Pexels
পৃষ্ঠা ৮৩: Photo by ALLAN FRANCA CARMO from Pexels
পৃষ্ঠা ৯৫: pexels-diego-madrigal-539694

এই ‘ই-বুক’টি প্রকাশের জন্য এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য আমরা যাঁদের কাছ থেকে ক্রমাগত উৎসাহ এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়ে চলেছিঃ শ্রী শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রী পিনাকী বিশ্বাস, শ্রী অসিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রী গৌতম বোস এবং শ্রী শুভ্র নাগ।

https://www.facebook.com/groups/183364755538153

মূল্যঃ অমূল্য

অক্ষরাঞ্জলি

মুখবন্ধ

আমাদের কথা

শরৎ প্রাতে, সোনালী আলোয়,
ওই চির নতুনের সাজে,
প্রতিধ্বনিত হোক শঙ্খ-ধবনি...
দেবীর চরণ-কমল তলে
আজ দিব মোরা অক্ষরাঞ্জলি...

বাংলার প্রাণে সাড়া জাগিয়ে শুরু হয় শারদোৎসব। এক সময়ে দুই বাংলা এক সূত্রে গ্রথিত ছিল সকল কর্মে ও সকল উদ্যোগে। কিন্তু কালস্রোতে সব কিছুই ভেসে যায় কিংবা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে এই পরিবর্তনটা বাহ্যিক। বাংলা ভাষা আজও সকল বাংলাভাষীদের ভালোবাসার সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে একইভাবে। এই দুই-বাংলার সাহিত্য ভাবনাকে মেলাবার প্রয়াসে 'অক্ষরাঞ্জলি'র শুভাগমন।

বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশের মানুষই করোনার প্রকোপে গৃহ-কেন্দ্রিক। এবার পুজোর আনন্দ-উল্লাস ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় সম্পূর্ণ রূপে গৃহ-আবদ্ধ। তাই এই মুহূর্তে আমাদের অবসর সময়ে একমাত্র সঙ্গী ও অনুপ্রেরণা হলো বই বা ই-বুক। তাই এই অবসর সময়ের সঙ্গী হিসাবে,

মুখবন্ধ

‘পাণ্ডুলিপি’র (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসরের) পক্ষ থেকে সকলকে ‘অক্ষরাঞ্জলি’ উপহার দেওয়া হলো। ই-বুকের ক্ষেত্রে এটি পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় প্রয়াস। আশা রাখি, সকল লেখক ও লেখিকাদের প্রয়াস পাঠককুলকে আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত করবে। ই-বুক হওয়ার কারণে এটি পাঠককুলের মধ্যে বিতরণ করা খুবই সহজসাধ্য। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সকল আগ্রহী পাঠকদের পড়ার সুবিধার্থে আমাদের এই বইটি বিনামূল্যে অনলাইনে প্রকাশ করা হলো। ■

ধন্যবাদান্তে,
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.), সম্পাদক
রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা

একটি ছোট্ট আবেদন

সহৃদয় পাঠকদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, ‘অক্ষরাঞ্জলি’ আপনার হাতে পৌঁছলেই, আপনার চেনা পরিচিত সবাইকেই এই ই-বুকটি প্রেরণ (forward) করুন।

ধন্যবাদান্তে,
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.), সম্পাদক
রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা

কলম হাতে

প্রবন্ধ – তৈরী থেকো পৃষ্ঠা ০৮
শুভ্র নাগ

প্রবন্ধ – রঙ্গ-রসিক কাজী নজরুল পৃষ্ঠা ১২
অসিত চট্টোপাধ্যায়

কবিতা – আয় মা পৃষ্ঠা ১৬
দিবাকর সেন

কল্পকাহিনী – অশ্বদেবতা পৃষ্ঠা ১৮
ডাঃ মালা মুখার্জী

কবিতা – সামিয়ানা পৃষ্ঠা ৩১
অমিত কুমার সাহা

গল্প – মৈত্রী-চুক্তি পৃষ্ঠা ৩২
অনির্বাণ বিশ্বাস

কবিতা – আরও একবার, শেষবার পৃষ্ঠা ৪০
নাহার আলম (বাংলাদেশ)

ছোট গল্প – ফেরা পৃষ্ঠা ৪২
রফিকুল নাজিম (বাংলাদেশ)

কবিতা – সত্যি কি পড়ে না মনে? পৃষ্ঠা ৪৮
প্রদীপ কুন্ডু

কলম হাতে

বড়োগল্প – মুক্তি — পৃষ্ঠা ৫০
স্বাগতা পাঠক

কবিতা – প্রিয়তমাসু — পৃষ্ঠা ৬৬
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

ছোটোগল্প – কাশফুল — পৃষ্ঠা ৬৮
দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

কবিতা – অবচেতন মন — পৃষ্ঠা ৭২
ফাল্গুনী গিরি মন্ডল

ছোটোগল্প – যোদ্ধা — পৃষ্ঠা ৭৪
পত্রালিকা বিশ্বাস

কবিতা – ডালিম — পৃষ্ঠা ৮২
অলোক লোদি (বাংলাদেশ)

গল্প – মৃন্ময়ী — পৃষ্ঠা ৮৪
রাজশ্রী দত্ত

কবিতা – এলোমেলো আশ্বিন — পৃষ্ঠা ৯৪
সিদ্ধার্থ বসু

নাটক – সত্যি কি পড়ে না মনে? — পৃষ্ঠা ৯৬
মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি

তৈরী থেকো

শুভ্র নাগ

আজ সকালে ঘুম ভাঙল হালকা ঠাণ্ডার আদুরে স্পর্শে। চোখ মেলে দূর আকাশে দেখি 'চিত্র শরৎ' সোহাগী রোদে ভরা সোনার আলো, তার সাথে সাযুজ্য রেখে নীল নীলিমায় ইতিউতি সাদা মেঘ... একটু পরেই পেঁজা মেঘের ঢেউ লাগল নীলাকাশ সাগরে। কত তার রূপ, কত তার ভঙ্গিমা, নিরাকারের বুকে যেন সাকারের পথ চলা; দিকহীন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। সামনের ছোট্ট বিলটা ইদানীং পদ্মদীঘি – কাশ ফুলের দোলায় দোলায়িত, শিউলি আলপনায় শোভায়িত তার চারপাশ। শহরতলীর মানুষ আমি। কোভিড কোভিড করে চলা 'কলে পড়া জন্তুর মত মূর্ছায় অসাড়' এই আধা শহুরে জীবনে একটু যেন প্রাণের ছোঁওয়া লাগল আজ, বিশের বিষে জরজর হয়েও কেমন যেন ভাল লাগা লাগা ভাব। কেন জানি না মন চাইছে এই ভালো লাগাটাকে আজ শরীরে মনে সমগ্র সত্তায় মেখে নিতে।

বিছানা ছেড়ে এলাম বাইরে। আকাশটা ঘনঘন রূপ বদলাচ্ছে। মূর্তিমান রসভঙ্গের মত স্তরে স্তরে জমা হচ্ছে জলভরা মেঘ — এও এক অপরূপ দৃশ্যকল্প।

প্রবন্ধ

মাথার উপরে শ্যামলা মেঘ আর সামনে আদিগন্ত শ্যামলিমা। একটু পরে আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সেই হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারার সাঁওতালী নাচ তালবাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়া সুরের ধারা, দীঘির জলে শোল-পোনাদের তরুণ পিঠে আলপনা, আর ডালপালাতে বৃষ্টির ঘড়িক ঘড়ি শব্দ; প্রকৃতির ক্যানভাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চিত্র শরৎ' আজ সত্যিই যেন চিত্রায়িত।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। শ্যামলা মেঘটা যাই যাই করেও ভেসে বেড়াচ্ছে। বৃদ্ধ সূর্য তার আকাশ পরিক্রমার অভিজ্ঞতা নিয়ে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। শ্যামলা মেঘের কানায় কানায় পরিয়ে দিয়েছে সোনালী পাড়, কনে দেখা আলোয় ভরে উঠেছে চারিদিক। পূবাকাশে নিটোল গোল চাঁদের হালকা আভাসে পশ্চিমে জাগছে সন্ধ্যাতারা।

সন্ধ্যা নামছে, এক কিশোরীর হাতে তুলসীতলায় জ্বলে উঠছে প্রদীপ, শাঁখ বাজাচ্ছে কেউ। কি অপূর্ব লাগছে ওকে শরতের স্নিগ্ধ শান্ত সন্ধ্যার পটভূমিতে, সাক্ষাৎ যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। আকাশটা কি পরিস্কার! মনে হচ্ছে, কে যেন পরম যত্নে একটি একটি করে তারাদের জ্বালিয়ে দিয়ে আকাশটাকে সাজিয়ে দিচ্ছে তারার মালায়। গহীন আঁধার বলে কিছু নেই আজ। রঙ-রূপ-ভালবাসা সব নিয়ে আকাশে আজ পূর্ণযৌবনা চাঁদ মায়াবী জ্যোৎস্নার প্লাবন লাগাল।

পৃথিবীতে দুধসাদা এই চন্দ্রালোকে ধুয়ে যাচ্ছি আমি। শরীরের পরতে পরতে নরম জ্যোৎস্না – মনে হচ্ছে যেন কোনো কল্পলোকে আছি। সব দুঃখ কষ্ট পার করে যেন কোনো অমৃতলোকে পৌঁছে গেছি। দূরে শতাব্দী প্রাচীন বটগাছটার কোটর থেকে সাদা পেঁচাটা বেড়িয়ে এসে বসল ডালে – শরতের আকাশে শারদশশী আজ তো শরতপূর্ণিমা। লক্ষ্মীপেঁচাটা তাই কি বেড়িয়ে এলো? কি ভুল... কি ভুল? ও তো আর জানে না আশ্বিনের এ শরতপূর্ণিমা সে শরতপূর্ণিমা নয়, এক মাসে দুই অমাবস্যার ফাঁদে পড়ে এ শরতপূর্ণিমা আজ নামহীনা, কুলহীনা, পথভ্রষ্টা এক তরুণী তিথি।

আজ আমি জাগব, সারা রাত শুনতে পাব কি না জানি না। তবু কান পেতে থাকবো, যদি এই অপরূপা শারদরাতে, এই নামহীনা, কুলহীনা তিথিতে ভুল করা ওই লক্ষ্মীপেঁচাটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে ভুল করে কেউ ডাক দেয় "কোজাগরী?"

প্রকৃতি পাঁজি মানে না চাঁদ অধিক অনধিক মাস বোঝে না। তাই তারা শরতেই আবহ তৈরি করে শরতপূর্ণিমার, মানা বা না মানা করা তো আমাদের ব্যাপার আর এই আবহেই তিনি নামবেন আজ – তৈরি থেকো... ■
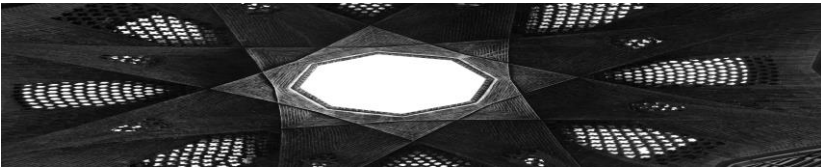
প্রবন্ধ

রঙ্গ-রসিক কাজী নজরুল

অসিত চট্টোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রানোচ্ছল মানুষ। যে কোনো মজলিসি আড্ডায় তিনি মধ্যমনি হয়ে উঠতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, "আমাকে বিদ্রোহী ব'লে খামোখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ।" কথাটা মিথ্যে নয়। তাঁর বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হ'ল। তিনি রাজরোষে পড়ে গেলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিল। কাজী নজরুলের গতিবিধি নজরে রাখতে হবে।

একবার তিনি গেছেন বেগম সোফিয়া কামালের বাড়ি। সোফিয়া কামাল নজরুলকে দাদু ব'লে ডাকতেন। কাজী সাহেব গেছেন তাঁর বাড়ি। তিনি কারো বাড়ি যাওয়া মানেই মজলিস বসে যেত, গানে গানে ভরে উঠত সে স্থান। কাজী সাহেব এসেছেন শুনে অনেকেই এসে উপস্থিত হ'ল। শুরু হ'ল গান, গল্প...

কাজী সাহেব লক্ষ্য করলেন দুজনের গতিবিধি যেন ঠিক লাগছে না। এরা তো মজলিসি আড্ডার রসগ্রহনে এসেছে ব'লে মনে হচ্ছে না। অন্য উদ্দেশ্য আছে। তিনি

বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা। তিনি যেমন মাঝে মাঝে ব'লে উঠতেন, 'দে গরুর গা ধুইয়ে' সেভাবেই হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "তুমি টিকটিকি / জানি ঠিক ঠিকই।" ব্যস, আর যায় কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক দুজন তড়িঘড়ি মজলিস ছেড়ে দিলেন ছুট। কান্ড দেখে সুফিয়া কামাল নজরুলকে জিগ্যেস করলেন, "তুমি চিনলে কি করে দাদু?" নজরুল উত্তর দিলেন, "গায়ের গন্ধে, বড় কুটুম্ব যে..."

সিরাজগঞ্জে যুব উৎসবে সভাপতি ছিলেন নজরুল। সম্মেলন শেষে যমুনার তীরে এক বাংলো বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয়েছে। পদ্মার ইলিশ। নজরুল খেতে বসেছেন। দু'টুকরো ইলিশ মাছ খেলেন। আবার তাঁকে ইলিশ দিতে এলে তিনি বললেন, "করছো কি? বিড়ালে কামড়াবে যে।" সকলে কাজী সাহেবের আকস্মিক রঙ্গ ধরতে পারছে না দেখে গিয়াসুদ্দিন সাহেব বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। বললেন, "কাজী সাহেব বলতে চাইছেন বেশী ইলিশ খেলে গা থেকে গন্ধ ছাড়বে। ইলিশ মাছের গন্ধে তখন বিড়াল পর্যন্ত আঁচড়াবে, কামড়াবে।"

সে সময় গজেন ঘোষের আড্ডা ছিল খুব বিখ্যাত। খ্যাতিমান, সাহিত্যিক, কবি বহু গুণীজন এসে জুটতেন সেই আড্ডায়। সেই ঘরে একটা টেবিল ছিল। তাতে বই পত্র, কাগজ কলম ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্র থাকতো। একদিন কাজী সাহেব ঘরে এসেই সেই টেবিল

পরিষ্কার করতে লেগে গেলেন। সব জিনিস নামিয়ে রেখে ধুলো সাফ করছেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, "এ কি পাগলামি?" কাজী সাহেব বললেন, "অহল্যা উদ্ধার, কোমল হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। প্রাণ সঞ্চার করতে হবে।" এর মধ্যে ঘরে এসে পড়েছেন গজেন ঘোষ মহাশয়। তিনি বললেন, "ওটা অর্গান। খারাপ হয়ে বহুদিন পড়ে আছে। ও আর বাজানো যায় না। তাই আমি টেবিল হিসেবে ব্যবহার করি।"

নজরুল তবু রিডগুলো নেড়ে-চেড়ে বাজানোর চেষ্টা করছিলেন। গজেন ঘোষ আবার বললেন, "ওটা আর বাজে না।" নজরুল তবু রিডগুলো নেড়ে চেড়ে চেষ্টা চালাতে চালাতে বললেন "কি করব গুরুর আদেশ। এই সব ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।"

কাজী নজরুল তখন গ্রামাফোন কোম্পানীর সাথে যুক্ত। গানের সুর করেন, ট্রেনিং দেন। একদিন দোতলার একটা ঘরে নিজের কাজে ব্যস্ত। একজন এসে বললেন, "ইন্দুদি (ইন্দুবালা দেবী) আপনাকে একবার নীচে ডাকছেন।" নজরুল বললেন, "আর কত নীচে নামাবে?"

একবার গ্রামাফোন কোম্পানিতে অনেক গুণীজন উপস্থিত। নানা কথা হচ্ছে। হঠাৎ একজন বললেন, "হঠাৎ যদি ভাগ্যে এক লাখ টাকার লটারী লেগে যায় তবে বৌকে কে কি দেবে?" কেউ বললেন, "অনেক দিন ধরে ভাবছি কিন্তু পেরে উঠছি না, লটারী পেলে বৌকে সোনার হার কিনে দেব।" কেউ

বললেন, “আমি আমার বৌকে বেনারসী দেব।” নজরুল বললেন, “আমি আমার বৌকে কি দেব শোন।” ব’লে একটা গান শোনালেন। গানের কথাগুলি ছিল এইরকম —

“মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী, দেবো খোঁপায় তারার ফুল
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতি চাঁদের দুল।
কণ্ঠে তোমার পরাব বালিকা
হংস সারির দুলানো মালিকা।
বিজলী জরিন লাল ফিতা দিয়া
বাঁধিব তোমার চুল।
জ্যোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়
রামধনু হ’তে লাল রং ছানি আলতা পরাব পায়।
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব গো প্রিয়া,
তোমারে ঘেরিয়া নাচিবে আমার কবিতার বুলবুল।”

গান শেষ করে নজরুল বললেন, “দেখলে তো আমি আমার প্রিয়তমাকে এত কিছু দেব, কিন্তু আমার এক পয়সাও খরচ হবে না।” ■

আয় মা

দিবাকর সেন

আশঙ্কা আর আশার দোলায়
হচ্ছে এবার মায়ের পূজা
একটি বছর পার করে ফের
শারদ প্রাতে তোমায় খোঁজা।

তুমি এলে জগত আলো
কি করবে আর করোনা?
থাকবো বসে তোমার আশায়
একটু করো করুণা।

লকডাউনে গৃহবন্দী
মানতে হবে ব্যবধান
তাইতো ডাকি আয়মা আমার
ফেরাস না এই আকুল আহ্বান।

চাকরি যাচ্ছে যাকনা
বেতন কেটে দ্বিখন্ডিত
চলছে যেমন, চলুক তেমন
হইনি আমরা আতঙ্কিত।

কবিতা

দগদগে ঘা আজও আছে
জ্বলছে আগুন চলছে দাঙ্গা
তবু তোমার আগমনী
জানান দেয় ঐ পলাশ রাঙ্গা।

ভাসছে সাদা মেঘের ভেলা
নীল শরতের আকাশ জুড়ে
আকাশ বাতাস মুখরিত
তোমার আগমনীর সুরে।

বাড়ি ফেরা হবে না, মা
ঠিক করেছি সবাই মিলে
ভক্তি ভরে ডাকবো তোমায়
মর্তে তুমি নেমে এলে।

মুছে যাক্ করোনা
ঘুচে যাক সব ভয়
তোমার আশিস থাকলে সাথে
হবেই হবে মোদের জয়। ■

অশ্বদেবতা

ডাঃ মালা মুখার্জী

লাহোর দুর্গে আজ সাজো সাজো রব। সকালের নামাজের সাথে সাথে সৈন্যরা চৌগান খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। চৌগান খেলার জন্য সুলতান যে অশ্বটিকে নির্বাচিত করেছেন তার মতো অবাধ্য ঘোড়া লাল মহম্মদ আর দু'টি দেখেনি। আজ প্রায় দশ বছর ধরে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের অশ্বশালার দেখাশোনা করছে ও, কম বেয়াড়া ঘোড়া দেখেনি। তবে এই ঘোড়াটা একদম অন্যরকম।

ধবধবে সাদা আরবী ঘোড়া, সুগঠিত গ্রীবা, কালো রেশমী কেশর আর দুটো মায়াবী চোখ, দেখলেই প্রাণীটাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়। লাল মহম্মদ অনেক চেষ্টা করেছে ভালোবাসতে, কিন্তু জেদী ঘোড়াটা যেন পণ করেছে সুলতানের অশ্বশালার দানাপাণি গ্রহন করবে না।

তবে সুলতানের আদেশ। ঘোড়া যেন সুস্থ থাকে, কাল এই শফেদের পিঠে সওয়ার হয়েই চৌগান খেলবেন তিনি। শফেদ, হ্যাঁ, শফেদ হলো এই ঘোড়াটার নতুন নাম, স্বয়ং সুলতান এই নাম রেখেছেন। কত বড় সৌভাগ্য শফেদের ভাবো! কিন্তু অবোধ প্রাণীটার সে বোধ নেই। তবে শফেদ কি সত্যিই অবোধ?

লাল মহম্মদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “শুভ্রক বেটা, চানা খা লে...” শফেদ নিজের পুরানো নামটা শুনে লালকে দেখল। শফেদের দীর্ঘ চোখে অশ্রু ছলছল করে উঠল। তবে খাবারে মুখও দিল না। মেবার থেকে আসা ইস্তক শফেদ কিছুই খাচ্ছে না। এমন প্রভুভক্ত ঘোড়া লালমহম্মদ জীবনে দেখেনি।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উৎকৃষ্ট অশ্ব, অস্ত্র সংগ্রহ করাই নিয়ম। সেই নিয়ম মেনে আজ অবধি সুলতান যত রিয়াসতকে জিতেছেন সব জায়গা হতেই সংগ্রহ করেছেন উৎকৃষ্ট অশ্ব, অস্ত্র, মণিমুক্তো, আর নারী। ভরে উঠেছে অস্ত্রাগার, কোষাগার আর হারেম। এর মধ্যে অশ্বশালার দায়িত্ব লাল মহম্মদের। অশ্বকে শিখিয়ে পড়িয়ে সুলতানের উপযুক্ত করে তোলাই ওর কাজ। ও এই অশ্বশালার ‘আমীর-ই-আখুর।’ স্বয়ং সুলতানও নাকি এক সময়ে গজনীর সুলতান মহম্মদ ঘোরীর অশ্বশালার দায়িত্বে ছিলেন, এটা ভাবলেই লাল মহম্মদের ‘সিনা’ চওড়া হয়ে যায়। অবশ্য, এই গর্বটা ওকে মনের কোনেই লুকিয়ে রাখতে হয়, নচেৎ বিপদ। সুলতান তাঁর পূর্বজীবনের আলোচনা পছন্দ করেন না।

“ঘোড়া প্রস্তুত লালসাহেব?” সিপাহী আরবাজ খানের গলা শুনে লাল মহম্মদ পিছন ঘুরে তাকালো। আরবাজ খান সুলতানের খাসরক্ষী, “শুনো, ঘোড়া যেন একদম তন্দরুস্ত থাকে। কাল এর পীঠে চেপে সুলতানে আলম চৌগান খেলবেন।”

লাল মহম্মদ মাথা ঝাঁকিয়ে বলার চেষ্টা করল, “জী, খানসাব...” সুলতানের অন্যতম পছন্দের খেলা চৌগান। প্রতিটি যুদ্ধজয়ের শেষে চৌগান খেলেন সুলতান। আর মেবারের বিরুদ্ধে এ জয় তো বিশেষ জয়! প্রায় এক দশক আগে ঘটে যাওয়া এক অপমানের বদলা!

“এ খেলা সাধারণ নয়, বিশেষ।” আরবাজ খান গলাটা নামিয়ে বলল, “খেলায় প্রতিদ্বন্দী কে জানো? মেবারের রাণা করণ সিং!”

চমকে উঠলো লাল মহম্মদ, রাণা করণ সিং। শফেদ তার মালিকের নাম শুনে চঞ্চল হলো মনে হলো। মেবারের কিশোর রাণা লাহোর দুর্গের রাজবন্দী, এই শফেদ ওরফে শুভ্রক তাঁরই বাহন। সুলতান রাজবন্দীর ওপর অত্যাচার না করে চৌগান খেলবেন? নিশ্চয় কিছু ব্যাপার আছে!

“এবারের চৌগানে সুলতান বিদ্রোহী রাণার মুণ্ড নিয়ে খেলবেন,” আরবাজ গলা নামিয়ে বলল, “পাক্কা খবর তারপর, মুণ্ডুটা তোফা হিসেবে পাঠানো হবে মেবারের রাণী কুমারদেবীর কাছে, অপমানের বদলা হিসেবে...”

দুজনে চাপা গলায় হেসে উঠতেই শুভ্রক হ্রেষাধ্বনি ছাড়ল, যেন প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো অশ্বকণ্ঠে। “বেচারা! এরই পিঠে চেপে সুলতান রাণার গলা কাটবে...”

শুভ্রক দানার পাত্রটায় মুখ দিয়ে খেতে শুরু করলো। লাল মহম্মদ যারপরণাই বিস্মিত হলো। হঠাৎ শুভ্রকের

হলো কি? এতক্ষণ অবধি তো একটা দানাও দাঁতে কাটছিল না! “ও সুলতানের ঘোড়া হতে চায়। শাহী ঘোড়া!” আরবাজ খান হাসলো, “বুঝে গেছে ওকে তন্দরুস্ত থাকতে হবে!” খানসাহেবের সাথে লাল মহম্মদও অশ্বশালা হতে বেরিয়ে পড়লো।

লাহোর দুর্গে রাত্রি নেমেছে, রংমহলে গানের তালে তালে ভেসে আসছে নুপুরের ধ্বনি। কবি মিনহাজ নিশ্চয় এতক্ষণে মেবার জয়ের বীরগাথা কাব্যিক ঢঙ্গে পেশ করছেন সুলতানের সামনে। নিশ্চয়, এই জয়ের খুশীতে লাখো লাখো স্বর্ণমুদ্রা বিলিয়ে সুলতান তাঁর লাখবক্স নাম সার্থক করবেন, কিন্তু দুর্গের কারাগারে যে বীর মৃত্যুর প্রহর গুনছে সেও নাকি কম বীর নয়! লাল মহম্মদ শুনেছে এই রাণার মা আর নানীও নাকি দু-দুবার সুলতানদের পরাজিত করেছেন। লাল মহম্মদ এসব গল্পকে বিশ্বাস করতে চায় না, তা কি করে হয়? দিল্লির রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান যে গজনীর সুলতানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, সেই মহম্মদ ঘোরীকে এই কিশোরের মাতামহী কি করে পরাস্ত করতে পারেন? তবে, মেবারের রাণী কুমারদেবী যে অস্ত্রকুশলী যোদ্ধা তা লাল মহম্মদ গত যুদ্ধেই দেখেছে।

দশ বছর আগে মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেছিলেন সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক। রাণা সমর সিংহের মৃত্যু হতেই উল্লাসে ফেটে পড়েছিল সুলতানের

সৈন্যরা। সুলতান আদেশ দিয়েছিলেন চিতোর দুর্গে রাণীদের জহরের চিতা জ্বলে ওঠার আগেই সংগ্রহ করতে হবে অনন্য সুন্দরী নারীদের। সুলতানের সৈন্যদের সাথে লাল মহম্মদও চিতোর গড়ের প্রাচীর বেয়ে উঠেছিল দুর্গে। না, কেউ বাধা দেয়নি। ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল বাধা দেওয়ার কেউ নেই।

দুর্গের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে আছে সদ্য বিধবা, সদ্য সন্তানহারা মায়েদের আর্তনাদে পবিত্র কুণ্ডে স্নান করে, শেষবারের মতো মন্দিরে পুজো দিয়ে নারীরা চলেছে জহরস্থলের দিকে। ছদ্মবেশী শত্রুসৈন্যের উপস্থিতি কেউ টের পায়নি তখনো, অন্তত তাই মনে হয়েছিল। ওদের লক্ষ্য ছিল স্বর্গীয় রাণার দ্বিতীয় পত্নী কুমারদেবীর পাল্কি। এই নারী গুজরাটের সোলাঙ্কি বংশের রাজকন্যা। এঁর মাতা রাণী নাইকীদেবী কৌশলে গজনীর সুলতানের সোমনাথ আক্রমণ রুখে দিয়েছিলেন। একে তো হারেমে নিয়ে যেতেই হবে! তবেই নেওয়া হবে অপমানের প্রতিশোধ।

রাণার প্রথমা পত্নী পৃথ্বীবাঈয়ের পাল্কি জহরস্থলে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যেতেই, দ্বিতীয় পাল্কি দেখা গেল। শত্রুসৈন্য আকস্মিকভাবে পাল্কি কাহারদের আক্রমণ করতেই তারা পাল্কি নামিয়ে পালালো। উৎসাহিত সুলতান স্বয়ং পাল্কির দরজা খুলতেই আঁতকে উঠলেন, এ কি? পাল্কিতে তাঁরই

গুপ্তচরের মৃতদেহ? এই তো চিতোরের ভিতরের সংবাদ তাঁকে প্রেরণ করতো!

সুলতান পাল্কি থেকে বেরোনো মাত্রই অনুভব করলেন ঠাণ্ডা ইস্পাতের পাত তাঁর শরীর ছুঁয়ে রয়েছে। মেবারের সৈন্যরা দুর্গের ভিতর সুলতানের সৈন্যদের কচুকাটা করছে। তাঁর সাথে লড়ছে এক রাজপুত যোদ্ধা, যার মুখ পাগড়ীর কাপড়ে ঢাকা। মুহুর্তে হতচকিত হয়েছিলেন সুলতান! রাণা সমর সিং ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তো মারা গেছেন। দ্বিতীয় পুত্র নেহাতই শিশু! তবে, এই বীর কে?

যোদ্ধা যেই হোক তার যুদ্ধকুশলতার আভাস সেদিনই পেয়েছিলেন দিল্লির সুলতান। বুকে গভীর ক্ষত নিয়ে পালাতে পারলেও তাঁর কানে বেজেছিল একটাই নাম। "জয় রাণী কুমার দেবী কি..." পুনরায় নারীর হাতে পরাজয়!

দিল্লির সুলতান বারবার মেবার আক্রমণ করেছেন, প্রতিবার রাণী বাধা দিয়েছেন। এবার আর একা নয়, রাজপুতানার নয়জন রাজার ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে রাণী বিধ্বস্ত করেছেন সুলতানের বাহিনীকে। ছারখার হয়ে গিয়েছিল তুর্কীবাহিনী, আজও চোখ বুঝলে সেই সব যুদ্ধের ভয়াবহতা লাল মহম্মদের স্মৃতিপটে ভাসে। সেদিনই সুলতান বুঝেছিলেন যে সম্মুখ সমরে রাণীকে হারানো সম্ভব নয়। তাই ছিল সুদীর্ঘ অপেক্ষা...

বারো বছর বাদে সে সুযোগ এসেছিল। সুলতানের প্রিয় সেবক আরাম বক্স খবর এনেছিল, কুমার করণ সিংয়ের ত্রয়োদশতম জন্মতিথিতে তাঁর রাজ্যাভিষেক হবে। রাণী নিজে হাতে কুমারের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে বাকী জীবনটা গুরুর আশ্রমে কাটাবেন ঠিক করেছেন। ঠিক এই সুযোগটাকেই কাজে লাগানো হয়েছে।

রাজ্যাভিষেকের পর কিশোর রাণা যখন মেবারের নিয়মানুযায়ী মৃগয়ায় গিয়েছিলেন, ঠিক তখনই আরাম বক্স তাঁকে অপহরণ করে। রাণার তেজী আরবী ঘোড়াটাকেও নিয়ে আসেন। এমন তেজী ঘোড়া সুলতানেরই বাহন হওয়া উচিত। গোলাম আরাম বক্স রাতারাতি আরাম শাহ হয়ে গেছেন, খুব শিগগিরি বড় শাহজাদির সাথে নিকাও হয়ে যাবে। 'কেয়া কিসমত হ্যায় উসকা!' লাল মহম্মদ যখন আরাম বক্সের ভাগ্যকে হিংসা করছে ঠিক তখনই কবি মিনহাজ-ই-সিরাজ রাত জেগে লিখে চলেছেন ভারতের প্রথম সালতানতের ইতিহাস। কাল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। প্রবল পরাক্রমশালী রাজপুতানা বোধহয় শেষমেষ সালতানতের অধীনস্ত হবে। মিনহাজ লেখালিখি থামিয়ে প্রাসাদের বাইরে এলেন। তিনি জানতে চান, এ মুহুর্তে রাণা করণ সিং ঠিক কি ভাবছেন।

কারাগারের রক্ষীরা তাঁকে থামালো না। অন্ধকার কারাগারের মধ্যে মশালের আলোই ভরসা। কারাকক্ষের

মধ্যে পাথরের বেদীতে রাণা বসে আছেন। মিনহাজকে দেখে কিশোর রাণা এগিয়ে এলেন, তাঁর চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই।

"রাওয়াল, কাল তোমার জন্য কি অপেক্ষা করছে জানো?" মিনহাজ জিজ্ঞেস করলেন।

"মৃত্যুদণ্ড," করণ সিং শান্তভাবে বললেন, "আপনি আপনার ইতিহাস বইতে লিখবেন একটি নতুন অধ্যায়, সম্ভবত সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়।" রাণা হাসলেন, বিদ্রূপের হাসি, "এতদিন সুলতানের বীরগাথা লিখেছেন, এবার লিখবেন, কিভাবে ছলে-কৌশলে মেবারের রাণাকে অপহরণ করলেন সুলতান..." "আমি চাইলে মৃত্যুদণ্ড রদ হতে পারে," মিনহাজ বললেন, "সন্ধিতে যদি রাজী হও।"

"সন্ধি সমানে সমানে হয়," রাণা বললেন, "ভুলে যাবেন না, আমার মাতামহী নাইকীদেবীকে।" নামটা শুনে মিনহাজের চোয়াল শক্ত হলো, তিনি তাঁর বইয়ের পাতায় এই বীরাঙ্গনাকে স্থান দেননি। ভবিষ্যতের মানুষ জানবেও না কেন সুলতান মহম্মদ ঘোরী সতেরবারের বার সোমনাথ লুঠ করা তো দূর অস্ত, আরাবল্লীর গিরিবর্ত্ম গদরঘাটা পেরতেই পারেননি! গদরঘাটার যুদ্ধই ছিল সুলতান ঘোরীর হিন্দুস্তানের শেষ লড়াই। কোনো পুরুষ রাজা যা পারেননি, সোলাঙ্কি বংশের বিধবা রাণী নাইকীদেবী তা পেরেছিলেন। শুধুমাত্র তাই নয়, মহম্মদ ঘোরী যাতে আর না ফিরে আসেন তার

জন্য চিতোরের রাণা সমর সিংয়ের সাথে তাঁর ছোটো মেয়ের বিয়ে দিয়ে যবন-বিরোধী মোর্চাকে শক্ত করেছিলেন।

"ভুলে যাবেন না আমি বীর বাপ্পা রাওয়ালের বংশধর। আমার পিতা ও ভ্রাতা পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন। আমার বীরাঙ্গনা মাতা জহর করেননি, শুধুমাত্র মেবারভূমিকে বাঁচাতে...." বন্দী কিশোরের চোখ দুটো গর্বে ঝকঝক করে উঠল।

"বেশ, কাল অপমানের সাথে মৃত্যুকে বরণ করো তবে, রাওয়াল..." মিনহাজ চলে এলেন, কিন্তু রাণা কারাগারের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ঘোড়া শুভ্রককে সুলতানের সৈন্যরা কি করলো কে জানে?

শুভ্রক তাঁর বারো বছরের জন্মদিনের বিশেষ উপহার। ঠিক এক বছর আগে একজন আরব সওদাগর চিতোরে ঘোড়া বেচতে আসে। সৈন্যবাহিনীর জন্য ঘোড়া কেনা চলছিল। তখনই একটা সাদা ঘোড়া নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, কেউই তাকে বাগে আনতে পারছিল না। আসলে আরবী ঘোড়া এর আগে চিতোরের অশ্বশালায় আসেনি, মেবারে মূলত মাড়োয়াড়ী, সিন্ধ্রি আর কাথিওয়াডি ঘোড়াই ব্যবহৃত হয়। রাণা করণ সিং শুভ্রককে বাগে আনেন। ঘোড়াটা তাঁকে এমনভাবে মেনে নিয়েছিল যেন ওনার জন্যই শুভ্রকের জন্ম! শুভ্রক খেয়েছে তো? তাঁকে ছাড়া ও খায়ও না!

এমন নানা ধরণের চিন্তায় রাত কেটে গেল, রাণা শুনতে পেলেন আজানের ডাক। একটু পরে তাঁকেও নিয়ে যাওয়া হবে বধ্যভূমিতে। মরতে ভয় পান না তিনি। তিনি যে রাজপুত! কিন্তু এ যে যুদ্ধভূমি নয়, বধ্যভূমি। তিনি যুদ্ধে হারেননি, বিশ্বাসঘাতকতায় হেরেছেন, অপহৃত হয়েছেন। রাণা কারাগৃহে আত্মঘাতী হতে চেয়েছিলেন, পারেননি। সুলতানের কারাগারে কড়া পাহাড়া! একটু পরেই তাঁকে তাতার প্রহরীরা নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে। রাজবন্দী হিসেবে নূন্যতম সম্মানও রাণা পেলেন না। অকস্মাৎ অন্ধকার কারাকক্ষ হতে প্রকাশ্য দিবালোকে এসে চোখ বুঝলেন রাণা। চিরপরিচিত হ্রেষাধ্বনি শুনে চোখ খুললেন। একি? শুভ্রক? শুভ্রকের পীঠে রয়েছেন স্বয়ং সুলতান, আর শান্তভাবে তাকে বহন করছে আরবী ঘোড়াটা। রাণা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মানুষ যখন ছল করতে পারে, ঘোড়া কেন নয়? রাণা করণ সিংকে চৌগান ক্ষেত্রের বিশাল মাঠের মাঝখানে দাঁড় করানো হল, খুলে দেওয়া হলো হাত-পায়ের বেড়ি। শুরু হলো চৌগান। সুলতান শুভ্রকের পিঠে চড়ে ছুটে আসছেন, তাঁর হাতের ছড়িটি একটি বিশেষ ধরণের তলোয়ার, যা এক কোপে না হোক, একাধিক আঘাতে তাঁর শিরচ্ছেদ ঘটাবে, আর সেই কাটামুণ্ড নিয়ে চৌগান খেলা হবে। তারপর হয়তো তাঁর মায়ের কাছে মুণ্ডটি পাঠানো হবে, অপমানের বদলা

হিসেবে। সুলতান মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবেন তাঁরই প্রিয় অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে।

রাণা ছুটে পালানোর চেষ্টা করলেও পায়ে হেঁটে কতদূর পালাবেন? সারা মাঠ ঘিরে আছে সুলতানের পার্ষদরা, আত্মীয়-বন্ধু, আর সেনাপতিগণ, তাছাড়াও আছে লাহোরের কৌতুহলী জনতা। বন্দী রাণার মৃত্যুদণ্ড দেখার উৎসাহ তাদেরও কম নয়। সুলতান শুভ্রকের পীঠে সওয়ার হয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছেন। রাণা চোখ বুঝলেন। “চিঁহিহিহিহি..........” পরিচিত হ্রেষাধ্বনির সঙ্গে এক মর্মান্তিক আর্তনাদ। রাণা চোখ খুললেন । যে আর্তনাদ তাঁর হওয়ার কথা ছিল সেই আর্তনাদ দিল্লিশ্বরের কণ্ঠে। কয়েক মুহূর্তেই বিষয়টা পরিষ্কার হলো রাণার কাছে।

শুভ্রক অন্তিম মুহূর্তে দুই পা খাড়া করে তার পিঠ থেকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়েছে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবককে। তাঁর লোকজনেরা ছুটে আসার আগেই নিজের সামনের দুইপা দিয়ে অনবরত আঘাত হেনে চলেছে তাঁর বুকে। সুলতান স্বপ্নেও ভাবেননি এমন হবে। লাল মহম্মদ বলেছিল, শফেদ দানাপানি খাচ্ছে, তিনি নিজেও দুএকবার সওয়ারী করেছেন শফেদের পীঠে। কই এমন তো হয়নি? “আহ্...” সুলতান অন্তিম শ্বাস নেওয়ার আগেই রাণার হাতের স্পর্শে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শুভ্রক। করণ সিং কালবিলম্ব না করে লাফিয়ে চড়লেন শুভ্রকের পীঠে, আর হ্যাঁ, মৃতপ্রায়

সুলতানের তরোবারিটাও নিতে ভুললেন না। তলোয়ার হাতে অশ্বারোহী রাজপুতকে কে বাধা দেবে? এমন সেনাপতি এখনও জন্মায়নি। খুব সহজেই আরাম শাহের সৈন্যদের হারিয়ে লাহোরের সীমানা ত্যাগ করলেন রাণা। টানা তিন দিন, তিন রাত পেরিয়ে যখন চিতোরে পৌঁছলেন তখন রাণা দেখলেন তাঁর মা-শা আমৃত্যু যুদ্ধের ডাক দিয়ে সৈন্য সাজাচ্ছেন। শেষবারের মতো যুদ্ধে যাওয়ার আগে কুলদেবী কালীমায়ের আরতি করছিলেন রাজমাতা কুমারদেবী। চির পরিচিত হ্রেষাধ্বনিতে পিছন ফিরে চাইলেন রাজমাতা। শুভ্রকের পীঠে তাঁর আদরের লাডো-শাকে দেখে ছুটে এলেন মন্দির-প্রাঙ্গনের বাইরে।

রাণা শুভ্রকের পিঠ থেকে নামতেই সাদা ঘোড়া বসে পড়লো চিতোরের মাটিতে, অন্তিমবারের মতো হ্রেষাধ্বনি ছেড়ে চোখ বোঝার আগে চাক্ষুষ করতে চাইলো মা-ছেলের পুণর্মিলনের দৃশ্যটি। তিন দিন, তিন রাত কোথাও না থেমে ছুটেছে সে, শুধুমাত্র চিতোরের রাণাকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে। এহেন অশ্বদেবতাকে যখন চিতোরবাসী রাজসম্মানে বিদায় জানাতে ব্যস্ত, তখন দিল্লির মসনদে চলছে নতুন কোনো সুলতানের রাজ্যাভিষেকের পালা।

ভারতের প্রথম সুলতানের মৃত্যুর কারণটা লিখতে গিয়ে থমকালেন মিনহাজ, তারপর লিখলেন চৌগান খেলতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারা গেছেন সুলতান

কুতুবউদ্দিন আইবক। শাস্তিস্বরূপ অশ্বপালকের প্রাণদণ্ড হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় কি সব সময় সত্যি কথাটা লেখা যায়? গবাক্ষ দিয়ে বাইরে তাকালেন মিনহাজ। প্রাসাদের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক সুউচ্চ নির্মীয়মান মিনার, যা ভবিষ্যতে কুতুবমিনার নামে খ্যাত হবে। হিন্দুস্তানের প্রথম সুলতানের অন্তিম অধ্যায়ের কথা মনে রাখবে না কেউই। মিনহাজ চোখ সরাতে যাবেন, হঠাৎ মনে হলো একটা সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ কুতুব মিনারের সুউচ্চ শিখরকে এমনভাবে পেরিয়ে গেল, যেন, একটা সাদা ঘোড়া সালতানাতের গর্বিত চূড়াটাকে ডিঙিয়ে পাড়ি দিল অনন্তলোকে।

(কাহিনীসূত্র: মেবারের লোকগাথা অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক কল্পকাহিনী ।) ■

কবিতা

সামিয়ানা

অমিত কুমার সাহা

একখন্ড দুঃখ আমার,
কয়েকখন্ড বছর মাঝে;
একমুঠোতে ধরা নদী,
কেমন করে ফসকালো যে!

চারখন্ড হৃদপিন্ডতে,
তিনটি আবেগ ভরে রাখা;
একটি খন্ড ফাঁকাই থাকে,
বাঁধুক বাসা ভালোবাসা।

শরীরটাকে নিঙরে নিলে,
মিলবে শুধুই কষ্ট জমা;
চাওয়া পাওয়ার ডিসেকশনে,
উড়ুক প্রেমের সামিয়ানা। ■

গল্প

মৈত্রী-চুক্তি

অনির্বাণ বিশ্বাস

"হ্যাঁরে বিদেশী মানে কি? মেমসাহেব?" সুমনের মা বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন। সুমন হেসে বলল, "না গো মা, মেমসাহেব ঠিক নয়..."

"সে কি পাকিস্তানি নাকি... হে ভগবান আমাকে রক্ষা কর! আমার ছেলের মাথায় সুবুদ্ধি দাও। কি হবে? ও গো আমাদের বুকান শেষে কিনা..." সুমনের মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। সুমনের বাবা স্নান সেরে ঠাকুর প্রণাম করে সুমনের মায়ের পরিত্রাহি চীৎকারে দৌড়ে স্কাইপের সামনে এসে জিজ্ঞাসু মুখ নিয়ে দাঁড়াতে ছেলে বলল, 'বাবা, মাকে বোঝাও পাকিস্তানি নয়, চাইনিজ।'

সুমনের বাবা ও মায়ের মুখ যা বড় হাঁ হয়ে গেল, তাতে একটা বড় মাছি অনায়াসেই ঢুকে যেতে পারত। কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব থাকার পর সুমনের মা বলে উঠলেন, "যাক বাবা, তাও নিশ্চিন্ত। তা একদিকে ভাল ঘরের টিকটিকি, আরশোলা আর থাকবেনা।"

সুমনের বাবা মুখটা একটু পানসে করে বললেন, "শেষে চীনে বউ! কি করে কথা বলব রে? তা তোরা তো বিদেশে

থাকবি। কিন্তু মানে... ওদের অক্ষরগুলোর মতো... মানে... বিয়েটা কিভাবে করবি? ওরা বুদ্ধিষ্ট, তার মানে তোরা কিছু কি ভেবেছিস্?"

"হবে না, এ বিয়েও আমি মানতে পারবনা।'" সুমনের মা রেগে বললেন। সুমন অনুনয়ের সুরে বলল, "মা, একটু রাজি হয়ে যাও প্লিজ্...ও মোটামুটি এখন বাংলা বলতে পা... আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যাবেলা ট্রেনিং দিচ্ছি। দেখো মা, কাম হিয়ার।"

ওদের সামনে শর্টস আর গেঞ্জি পরা একটা মেয়ে এসে হাতজোড় করে বলল, "নমস্কার, আপনিরা কেমন আছে?" সুমনের বাবা-মা এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর একটু ঢোক গিলে বললেন, "ভাল থাক, কি বলি... মা! একটু থেমে... "তুমি বাংলা বোঝ? আমরা তো তোমাদের চীনে ভাষা জানিনা। কি করে কথা বলি বল তো? কি নাম তোমার?"

"লিও চ্যাং। আপনি ওরিড হবেন না। আমি বাংলা লার্নিং ঠিক শিখে যাব মা আর আমি ভেজিটেরিয়ান। সো নো প্রবলেম। ও তো জানে। আমার জন্য ও তো মাঝে মাঝে ভেজ খায়।" সে হেসে বলল।

সুমনের মা-বাবা দুজনে একটু চোখাচুখি করে বললেন, "মানে তোমরা একসঙ্গে থাক?" সুমন দুম করে ল্যাপটপটা

নিজের দিকে করে বলল, “আরে না, ও মাঝে মাঝে এসে রান্না করে। একসঙ্গে না রে বাবা।”

“হে ভগবান, শেষে এও শুনতে হল! হ্যাঁ রে আর কোনো খবর-টবর নেই তো! হে ভগবান! থাকলে একেবারে বলে দে লোকজন, আত্মীয়-স্বজনকে কি বলব!” সুমনের মা বেশ বিচলিত হয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন।

“দূর না রে বাবা, না। বাবা, মা কি যা-তা বলছে। বিয়ের আগে এসব ছিঃ...” সুমন উড়িয়ে দিল।

হঠাৎ ক্যামেরার সামনে এসে লিও সুমনের মাকে আশ্বস্ত করে বলার চেষ্টা করল, “ডোন্ট ওরি, অ্যাই এগ্রি উয়িথ ইউ। ইয়েস মা, বিয়ের আগে ওসব নয়। আমরা গুড প্রোটেকশন্...।” সুমন লিওর মুখটা চেপে ধরল। হঠাৎ সুমনের বাবা একটা ধপ্ করে আওয়াজ পেলেন। “কি হলো গো তোমার, সরসী। কি গো?” সুমনের বাবা দেখলেন তাঁর স্ত্রী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছেন। তিনি মুখে জলের ছিটে দিয়ে ডাকতে থাকলেন। “হোয়াট হ্যাপন্ড সুমন? বাবা কি হলো?” লিও কিছু বুঝতে পারছিলো না।

“তোমার জন্য... মূর্খ কোথাকার। প্রোটেকশন... আমি কোথায় বোঝাচ্ছিলাম।” লিওকে সুমন বকছিল। সুমনের বাবা বললেন, “ওকে বকিস না। ওদের দেশে...যাই হোক তোর মাকে দেখি, পরে কথা বলব। আর একটু মানে... দেখ যা ভালো বুঝিস।”

বলে একবার লিওর দিকে তাকিয়ে ল্যাপটপ বন্ধ করলেন। সুমনও ঢোক গিলে ডিসকানেক্ট হল।

সরসীর হঠাৎ জ্ঞান ফিরল, তারপর ধীরে ধীরে তিনি উঠে বসে বললেন, “কি সর্বনাশা কথা শুনলে আমার দুধের ছেলেটাকে কি রকম পাকিয়েছে। কি সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা! বলে কিনা একসঙ্গে থাকে, তাও আবার... ছিঃ ছিঃ...” এই বলে তিনি কানে হাত দিয়ে মাথা নেড়ে কাঁদতে থাকলেন।

“আহাঃ, তুমি এটা দেখলে না মেয়েটা কত সরল। আর ওদের দেশে তো কি বলে ওপেন সেক্স, ফলে ওরা এসব জানবে কি করে? আর দেখ, এখন ওদের জামানা, ওদের লাইফ। আমাদের সময় কি আছে? ওরা সারাজীবন ওখানেই থাকবে, নিজেদের সবকিছু বুঝে নেওয়াই ভাল, না হলে তোমার ঐ বোনের মেয়ের মতো ‘হি ইজ নট মাই টাইপ’ বলে বেরিয়ে আসবে সেটা ঠিক হবে?” সুমনের বাবা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ব্যস্, একেবারে গরম তেলে ট্যাংরা মাছ জলশুদ্ধ ছাড়লে যা হয়। সরসী একেবারে চিড়বিড়িয়ে উঠে বললেন, “কথায় কথায় আমার বাড়ির প্রসঙ্গ না টানলে আর হবে কেন? আর জগতে কোনো উদাহরণ নেই তো! আর নিজেরা সব কিছু নিজেদের দেখে নেওয়া ভালো বলতে কি বোঝাতে

চাইছ? ছিঃ ছিঃ, বাবা এরকম না হলে এরকম ছেলেপিলে হয়, ছিঃ ছিঃ...”

সুমনের বাবা একেবারে সরসীর ইয়র্কর্কার্টে ছক্কা। তার কোনো কথাই সরসীদেবী শুনতে রাজি নন। “কি রে কি হয়েছে রে, এতো চেঁচাচ্ছিস কেন?” তাঁরা হঠাৎ দেখলেন সরসীদেবীর বোন কখন দোতলায় এসে ঘরে ঢুকেছেন। সুমনের বাবার একবার মনে হলো নো বলে ছক্কা খাবার অবস্থা। মনে মনে চাকরের মুণ্ডপাত করলেও মুখে হাসি টেনে বললেন, “আরে তোমাদের কথাই হচ্ছিল। কি সৌভাগ্য... একটা সুখবর আছে?” “সুখবর! বলুন বলুন জামাইবাবু কি সেটা? তা দিদির মুখটা এরকম কেন?”

“তোমার দিদিকে আর প্রাক্তন এক মুখ্যমন্ত্রীকে হাসতে কম দেখা যায় তো? আরে সুমন বিয়ে করছে, দ্যাটস দ্য নিইজ।” বলে তিনি হাসতে থাকলেন। “ওয়াও, হোয়াট আ গুড নিউজ! কবে ডেট ঠিক করেছে? মেয়ে কি করে, কোথাকার?” সরসীদেবীর বোন খুব এক্সাইটেড... “কি রে! তোর মুখটা ওরকম কেন?” সে তার দিদিকে জিজ্ঞাসা করল।

“মেয়েটা চিনে বুঝেছিস। আর কি কথা! ওরা এখন থেকেই একসঙ্গে, ছিঃ ছিঃ” তিনি মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। সরসীদেবীর বোন এবার তাঁকে বোঝাতে থাকলেন, “আরে ও বিয়ে করবে, ওরা একসঙ্গে থেকে বুঝে নিচ্ছে যে ওরা

একসঙ্গে থাকতে পারবে, এতে সমস্যা কোথায় বল তো? আমাদের মতো সময় কি আছে? এই আমরা রুমলিকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে শিখিয়েছিলাম। অথচ দেখ লোক-লৌকিকতার কথা ভেবে দেখে-শুনে বিয়ে দিলাম। বিয়ের আগে আমার শ্বাশুড়ির কথা মতো দেখা অবধি করতে দিইনি। তাতে কি ফল হলো? দুজনের মানসিকতার বিশাল পার্থক্য থেকে ডিভোর্স পর্যন্ত গেল। দেখ, বর্তমান সমাজে একসঙ্গে থাকতে গেলে দুটি মনের মনের মিল হওয়া, দুজনের অ্যাডজাস্ট করার ক্ষমতা, অনেক ব্যপার থাকে। তাতে লিভ ইনে নিজেরা নিজেদের বুঝে নিতে অনেকটাই পারে। তাই এতে সম্পর্ক টেকে ভালো। কেননা একটা মানুষকে দুঘন্টার জন্য দেখা আর তার সঙ্গে সারাদিন থাকা ডিফারেন্ট ব্যপার। তাই আর তুই আপত্তি করিস না বুঝলি...

"তার মানে তুই বলছিস আমাদের সোশ্যাল ম্যারেজের কোনই গুরুত্ব নেই?" সরসীদেবী বললেন। "একদম না। তবে এটা অনেক সেফ। এ্যট লিস্ট ওরা তো তোকে কোনোদিন ব্লেম করতে পারবে না। রুমলি আমাদের যেমন আজও করে," বলে সে মাথা নীচু করে।

সরসী তার বোনকে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়।

"আর আপত্তি কোরনা সরসী, ওদের জীবনে ওদের স্বাধীনভাবে বাঁচতে দাও। দেখো জীবজন্তুদের। ছোট থেকে বড় করার পর তারা তাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়। আমরা

এতো উন্নত জীব হয়ে আমরা কেন পারব না বলতো? ওদের সুখেই তো আমাদের সুখ, তাইনা বলো!” এই বলে সরসীদেবীর হাতটা ধরলেন সুমনের বাবা।

হঠাৎ সরসীদেবীর বোনের ফোনটা বেজে উঠলো। সরসীদেবী ফোনটা ছোঃ মেরে নিয়ে কি শুনে বললেন। “ও মাসীকে দিয়ে সুপারিশ করা হচ্ছে তাই দেখি হঠাৎ সুমনা এসে উপস্থিত। এবারে বুঝলাম। স্কাইপ ওন করো তো, তুই ও কর।”

স্কাইপে লিও এসে বলল, “মা টুমি এখন ভালো। প্লিজ মা, আমাদের বিয়েটা গ্রান্ট করে ডিও।” লিও মুখের সারল্যে ভরা হাসি দেখে সরসীদেবী হেসে বললেন, “তা তোমাদের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে তো। কি করে বলবে?”

সুমন আর লিও একসঙ্গে হইহই করে উঠল। লিও বলল, "সুমনকে ওর পেরেন্টের খুবই পছন্দ। ওনারাও যোগাযোগ করতে আগ্রহী। আমি ইন্টারপ্রিটারের কাজ করব, ওকে।” তারপর কিছু কথা বলে ওরা বিদায় নিল। সরসীদেবীর মনটা একটু মুষড়ে ছিল। সুমনা ও তার স্বামী সেটা খেয়াল করেছিলেন। চাকর এসে এর মধ্যে চা জলখাবার দিয়ে গেল। সুমনের বাবা এরমধ্যে খবর চালিয়ে দিলেন। “দিদি এতো মন খারাপ করছিস কেন বলত? দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।” সুমনা বলল। “না, শেষে শত্রুদেশ! চীনেরা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সেই

দেশের মেয়ে কিনা আমার ঘরের বউ হবে! এটা মেনে নিতে পারছিনা,” সরসীদেবী বললেন।

“আরে ওরা লণ্ডনে সেটেল্ড। আর সব চাইনিজ লোক কি খারাপ? কেন আমাদের দেশের লোক সব ধোয়া তুলসী পাতা?” এই বলতে বলতে তারা টিভিতে শুনলেন চীনের প্রেসিডেন্ট জিংপিং ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিজীর মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তির সাক্ষর হচ্ছে পুনরায়। সুমনের বাবা হঠাৎ শিশুসুলভ চীৎকার করে বললেন, “গিন্নি আর ভেবনা। দেখ ঐদিকে মৈত্রী-চুক্তিতে স্বাক্ষর হচ্ছে। এদিকে আমরাই পিছিয়ে থাকি কেন? আমরা আমাদের সন্তানের বিবাহের মাধ্যমে দু দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের স্থাপনা করি না কেন!

কাল থেকেই বিয়ের তোড়জোড় শুরু করব। কালই আমরা লিওর মা-বাবার সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তি করব, কি বল সরসী?” এই বলে তিনি হাসতে থাকলেন। “পাগল একটা,” বলে মুখটা বেঁকিয়ে সরসী তার বোনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। ■

আরও একবার, শেষবার

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

আমি দাঁড়িয়ে আছি তোমার উপেক্ষার
কাছাকাছি;
হিমেল স্পর্শ দু'হাতের মুঠোয় নেবো বলে –
পাল্টানো দিন, আঁধার রঙিন করে আনবে।
আবারও শরৎ সন্ধ্যে জানি আজও!
তাই, বাড়িয়েছি দু'হাত গোধূলীর আঁচল পেতে
পতনের স্বাদ নেবো বলে আবারও,
আরও একবার! শেষবার!
অপেক্ষায় আছি দেখতে তোমার
ওই ক্রুর হাসির ঝলক,
যা আমার ভাবনাকে বদলে নিলো আমূলে!
বেদনার করাত শতকুচি করে কেটে নেয় আমায়;
উপেক্ষিত প্রহরের বিষাক্ত নির্যাসে
সচল হয়ে ওঠে হৃদয়ের রক্ত জল ঝরনা!
কী বিরল উপহার সব তোমার!
অপ্রাপ্তির হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে
আর্তচিৎকারে ভীষণ বলতে ইচ্ছে হয়...
আমি আর এ জনম চাই না;

কবিতা

যে জনমে প্রিয় কিছু মুখ কেড়ে নিলো।
জীবনের সকল সুখ আমার!
নষ্ট সময়ের বেহালায় ধুলোর মতো কেবল।
কিছু জমা পড়ে আছে পাঁজর ভাঙা আহত সুর,
যা মৃদুস্বরে তীর হয়ে বুকে বিঁধে থাকে
চোরকাঁটার মতো সমাধির পরেও —
পৃথিবীর আয়ু সমান দীর্ঘতায়। ■

ফেরা

রফিকুল নাজিম (বাংলাদেশ)

আফসার ফকির আবার ফিরে এসেছে বাইশ বছর পর মানুষটা আবার তার নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে। খবরটা বাঁশগাড়িয়া গ্রামের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। আহা! পৈত্রিক ভিটার শীতল মাটিতে সে উত্তর-দক্ষিণে শরীরটা টানটান করে শুয়ে আছে।

গত বাইশ বছরে বাঁশগাড়িয়া গ্রামের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রমত্ত পদ্মার বিষাক্ত ছোবলে এই গ্রামের মোট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বেশ কমেছে। ভাঙনের কারণে ভিটেমাটি হারিয়ে পরিচিত অনেকেই চলে গেছে দূরের কোনো শহরে-বন্দরে। আফসারের সেই পাঠশালাও সতেরো বছর আগেই রাক্ষুসে কীর্তিনাশা গিলে খেয়েছে। অথচ এই পাঠশালাতে শিক্ষার আলো জ্বালানোর জন্য সে কতই না পরিশ্রম করেছে। বাঁশগাড়িয়া গ্রামের প্রতিটি বাড়ি গিয়ে ছোটবড় সবাইকে ধরে নিয়ে এসে বর্ণ শিখিয়েছে আফসার। আচ্ছা, আজ কি আফসারের প্রিয় পাঠশালার জন্য মনে খুব কষ্ট হচ্ছে? হরমুজ মোল্লার কথা কি আফসার ফকিরের মনে আছে? পাঠশালা বন্ধের জন্য হরমুজ কত রকমের ষড়যন্ত্রই না করেছে! তবুও এক চুলও দমেনি আফসার।

ছোটগল্প

নদীর পাড় ধরে মানুষের লম্বা সারি। ক্ষেতের আইল ধরে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সব্বাই আফসার ফকিরের বাড়ির দিকে ছুটছে। গাঁয়ের বউঝিয়েরা মাথায় লম্বা গোমটা টেনে দ্রুত পায়ে হাঁটছে। বাইশ বছর পর লোকটা বাড়িতে এসেছে। খবরটা শুনেই উত্তরপাড়ার আশি বছর বয়সী জবান আলীও লাঠিতে ভর দিয়ে এসেছে প্রিয় বন্ধুকে একনজর দেখার জন্য। আসতে আসতে কত স্মৃতিই না মনে পড়ছে তার। পান চিবাতে চিবাতে পাশে দাঁড়ানো ছোকরার সাথে সেই সোনালী শৈশব ও কৈশোরের গল্প রসিয়ে কষিয়ে করছে।

উঠানে শোওয়া আফসার ফকিরের পায়ের কাছে বসে আছে তার একমাত্র ছেলে আকবর ফকির। বাবার মত সেও বাঁশগাড়িয়া গ্রামের সবার সুখে দুঃখে পাশে থাকে। হোমিও ডাক্তারি পাশ করে নিজের গ্রামের মানুষের সেবা করছে। বাজারেই একটা চেম্বার খুলে বসেছে। অনেকেই আকবর ফকিরের মুখের দিকে তাকালে নাকি আফসার ফকিরকে দেখতে পায়! বাপকা বেটা। চেহারায় দারুণ মিল। সেই ইস্পাত কঠিন হাতের পাজা। মুখে দৃঢ়তার জলছবি। চোখে গভীর এক মায়ায় দরিয়া ঢেউ খেলে। একদম আফসার ফকিরের মতোই।

আফসারের প্রতি ভালোবাসার টানে দূরদূরান্ত থেকে হাজারো লোক আসছে। সবার নয়নের মনি আফসার ফকির

এখনো বাইশ বছর আগের মতই। তাকে দেখে কেউ কেউ আসমানের দিকে তাকিয়ে 'সুবহানাল্লাহ' বলছে। শোকরানা আদায় করছে আল্লাহর কাছে।

ডিসেম্বরের শেষের দিক বেশ শীত পড়েছিল সে বছর। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের হাওয়া বেশ ভালোই লেগেছিল বাঁশগাড়িয়ায়। হরমুজের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য আফসারের বিকল্প কেউ ছিলো না। তাই গ্রামবাসী আফসার ফকিরকে মেম্বার প্রার্থী হওয়ার জন্য খুব জোরাজুরি করে। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আফসারও না করতে পারেনা। নির্বাচনের শুরুতেই হরমুজ অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। চারিদিকে শুধু আফসারের জয়গান। বিষয়টা হরমুজের মগজে বারবার পদ্মার উতলা ঢেউয়ের মতই আঘাত করতে থাকে। সে কোনো কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছিল না। নির্বাচনে হারলে তো হরমুজের আম-ছালা দুটোই যাবে। ক্ষমতা, চড়া সুদের ব্যবসা, জোর করে অন্যের জমি দখল, কিছুই আর সে করতে পারবেনা।

বিনা নোটিশে সেইদিন বাঁশগড়িয়া গ্রামের উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় উঠে। পাশার দান একদম পাল্টে যায়। কীর্তিনাশার রাক্ষুসে থাবা থেকেও মানুষ ফিরে আসে কিন্তু হরমুজ মোল্লা কারো প্রতি বাঁকা চোখে তাকালে তার হদিস শুধু পদ্মার জলই জানে। আর কেউ কোনোদিন টেরও পায়না। হঠাৎ নির্বাচনের দুইদিন আগে আফসারের বাড়ির পাশে আমগাছে

তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায় গ্রামবাসী। পাথুরে স্তব্ধতায় ডুবে যায় পুরো বাঁশগাড়িয়া গ্রাম। চোরা স্রোতে হারিয়ে যায় জলজ সব স্বপ্ন ও সম্ভাবনা। দ্রুতই ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। আফসারের লাশের সুরতহাল হয়। তার মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেই নথিভুক্ত করে পুলিশ। তারপর পদ্মার কত জল গড়িয়ে গেল দক্ষিণে। গ্রামের সবাই বুঝতে পেরেছিল, হারামি হরমুইজ্জা তার পথের কাঁটাকে সুকৌশলে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেদিন সাহস করে কেউ প্রতিবাদ করতে পারেনি। শুধু নূরা পাগলা বাঁশগাড়িয়া বাজারের এ-মাথা থেকে ঐ-মাথা পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল, 'হালা হরমুইজ্জা, তরে ঐ গাঙের কালা পানি ডাহে। তরে ফাঁসের দড়ি ডাহে।' সেইদিন আফসার ফকিরের এই নির্মম পরিণতি দেখে পুরো গ্রাম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

আজকের মত সেদিনও বাঁশগাড়িয়া গ্রামের সবাই আফসার ফকিরের বাড়িতে জড়ো হয়েছিল। বুক ভিজিয়ে কেঁদেছিল। তারপর অনেকদিন বাঁশগাড়িয়া গ্রামে কোনো উৎসব হয়নি। এমন কি কোনো বিয়েতেও না! প্রকৃতির অদ্ভুত প্রতিশোধ হরমুজও একদিন গুম হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করে পদ্মাই গিলে খেয়েছে হরমুজকে। তার লাশও পাওয়া যায়নি। পায়নি কোনো গোসল দাফনকাফন।

চলতি বছর বন্যার পানি হুহু করে বাড়ছে। গত তিন চার দিনে গ্রামে পশ্চিমপাড়ে ভাঙ্গন চলছে। গতকাল

বিকেলে আফসার ফকিরের কবরের অর্ধেকটা ভেঙে গেছে নদীতে। লাশের কাফনের কাপড়ের কিছু অংশ বের হয়ে আছে। মসজিদের বড় হুজুর ফজরের নামাজ পড়ে পদ্মার শীতল হাওয়া গায়ে মাখে রোজ। রোজকার মত আজও বড় হুজুর হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ায় আফসার ফকিরের কবরের পাশে। তাঁর হাঁকডাকে আকবরসহ গ্রামবাসী জড়ো হয় আফসারের কবরের পাশে। জ্ঞানী গুণী ও হুজুরদের আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কবর থেকে তাকে তুলে আনে সবাই।

একদম বাইশ বছর আগের মতই আছে লাশটা! শুধু সাদা মার্কিন কাপড়টা ধূসর হয়ে গেছে। আফসার ফকিরের পাশে জবান আলী তসবিহ গুনতে গুনতে বলে, ‘বড় হুজুর না দেখলে তো আফসারের লাশ আজক্কা গাঙে ভাইস্যা যাইত। আল্লাহর এই কুদরত তাইলে কি আমরা দেখতে পারতাম! সুবহানাল্লাহ। সব মাবুদের লীলাখেলা!’

কেউ কবর খুঁড়ছে। কেউ বাঁশ কাটছে। আকবর আলী এখনো তার বাবার পায়ের কাছে বসে আছে। গ্রামের নতুন কবরস্থানের জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে মধ্যপাড়ায়। পরম মমতায় আফসার ফকিরকে দাফনের জন্য বাঁশগাড়িয়াবাসী প্রস্তুত। খাটিয়ায় আবার উঠেছে আফসার ফকির। মনে হচ্ছে আফসার ফকির সবার সামনে সামনে হাঁটছে। আর পুরো বাঁশগাড়িয়া গ্রাম তার পিছু পিছু হাঁটছে, কাঁদছে। ■
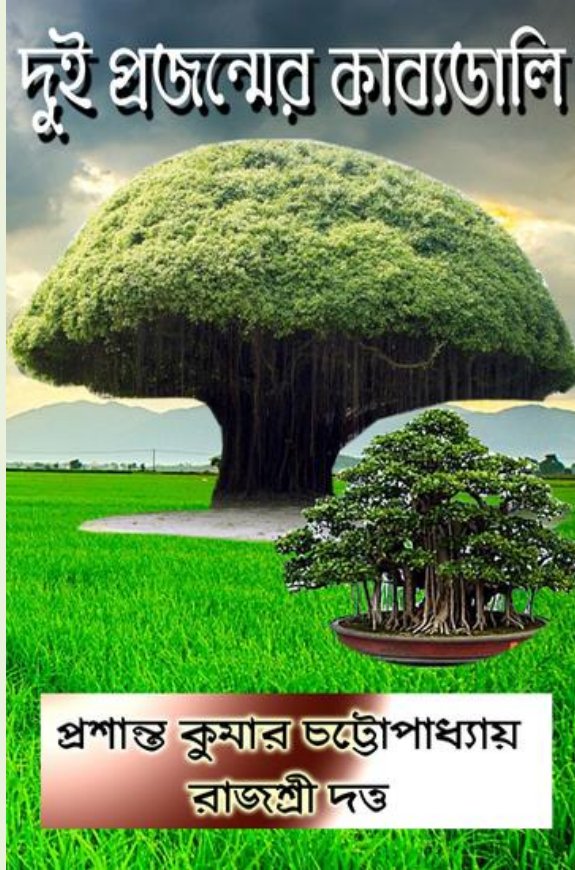
দুই প্রজন্মের কাব্যডালি
প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজশ্রী দত্ত

সত্যি কি পড়ে না মনে?

প্রদীপ কুন্ডু

এত ভালবাসি
তবু কোন অভিমানে
ফেলে রেখে গেলে মোরে প্রিয়,
বিনিদ্র রাতে পুড়ে যাওয়া মোমবাতির অন্ধকারে ?
একদিন তো তুমিই
দিয়েছিলে আমায় প্রতিশ্রুতি
বিপদ আসলেও তুমি থাকবে পাশে,
তোমায় তো ভালোবেসেছিলাম সেই দিন সেই অঙ্গীকারে।

তবে কি আজ
সেই প্রতিশ্রুতি হয়েছে নিষ্ফল ?
বিস্মৃত পৃথিবীর লাটিম সূর্যের তাপে
শূন্য নীল আকাশে শঙ্কিত মেঘের কম্পিত চাদর মুড়ে,
প্রতিশ্রুতি সাদা মেঘ
তবে কি আজ কালোয় ঢাকা ?
চেতনায় হারিয়েছে সপ্তসিন্ধু প্রেমের মর্ম
অচেনা অন্ধকার নেমেছে বুঝি আরো একবার হৃদয় জুড়ে !

জানি সময় আজ

কবিতা

ছুটেছে শুধুই তোমার দিকে,

তোমার খ্যাতি ছুঁয়েছে আকাশ শিখর

তোমার জীবন জুড়ে এখন প্রস্ফুটিত নন্দনকানন,

সত্যি কি তোমার, আমায় পড়ে না মনে ?

থাকো না বুঝি আর একলা ঘরে বসে,

পুরানো স্মৃতির সোপান হাতরে,

কখনো কি কাঁদে না তোমার মন... ■

মুক্তি

স্বাগতা পাঠক

প্রশান্ত বাবু হাতে একটা ছোটো সাদা রঙের ব্যাগ নিয়ে চৌমাথার দিকে হেঁটে চলেছেন। এর মধ্যেই ওনাকে দেখে চায়ের দোকান থেকে অতুল সেন ডাক দিলেন।

— ও গাঙ্গুলী বাবু কোথায় চললেন?

মুখ ঘুড়িয়ে অতুলবাবুকে দেখে সহাস্য বদনে এগিয়ে এসে প্রশান্ত বাবু বললেন, 'আরে আপনার বাড়িতেই তো যাচ্ছিলাম।'

— আমার বাড়ি?

— হ্যাঁ , তা ভালোই হলো এইখানে দেখা হয়ে গেলো। চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে, দোকানীকে দুটো চায়ের অর্ডার দিলেন প্রশান্তবাবু। অতুল সেন বললেন, "আরে না না আমার অর্ডারটা দেওয়া আছে।" এরপর প্রশান্তবাবু ব্যাগ থেকে একটা বিয়ের কার্ড অতুল সেনের হাতে দিয়ে বললেন, "আগামী ৯ই ফাল্গুন আমার মেয়ের বিয়ে স্বপরিবারে আসা চাই কিন্তু।"

— তাই নাকি? বাহ্ সে তো দারুন খবর।

— দেখুন দেখা হলো বলে এই চায়ের দোকানেই দিলাম। না হলে আমি বাড়ি গিয়েও বলে আসতে পারি।

— আরে না না ওতো ফর্মালিটির কি আছে?

— সকলে আসবেন কিন্তু, বৌদি আবার যদি কিছু মনে করেন বাড়িতে গিয়ে বলিনি বলে!

— ধুর মশাই, আপনিও পারেন বটে। ঈশানী কি শুধু আপনার মেয়ে নাকি ও তো আমাদেরও মেয়ে আর মেয়ের বিয়েতে বাবা মাকে ঘটা করে নিমন্ত্রন করতে হয় না। কথা বলতে বলতেই গরম চা এসে হাজির। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রশান্ত বাবু বললেন, "মেয়েরা কেমন যেন দেখতে দেখতে বড় হয়ে যায়। সময় কোথা থেকে বয়ে যায় বোঝাই যায় না। এইতো সেদিনের কথা, হাত ধরে আমার সাথে স্কুলে যেতো আর আজ..." কথাটা বলেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। বিয়ের কার্ডটা খুলতে খুলতে অতুল সেন বললেন, "যা বলেছেন মশাই, মেয়েদের জাতটাই এমন – কখন যে মেয়ে থেকে মা হয়ে ওঠে বোঝাই যায় না।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে পাত্র পাত্রীর নাম পড়তে পড়তে অতুল সেন চমকে উঠে বললেন, 'ঈশানী হাসান? গাঙ্গুলীদা এই দেখুন এদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়, গাদা গাদা টাকা নেবে কার্ড বানাতে আর নামের দফারফা করে রাখবে।" কার্ডটা প্রশান্ত বাবুর সামনে ধরে পাত্রীর নামের উপর আঙুল রেখে বললেন, "দেখুন দেখি ঈশানি গাঙ্গুলী না লিখে ঈশানি হাসান লিখে রেখেছে।"

প্রশান্তবাবু সেই দিকে খুব বেশি পাত্তা না দিয়ে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললেন, “না দাদা কিছু ভুল নেই সব ঠিকই আছে।” অতুল সেনের কপালে ভাঁজ পড়ল। প্রশান্তবাবু এবার ওনার দিকে তাকিয়ে বললেন, “অবাক হচ্ছেন?”

— অবাক হওয়ার মতোই তো ব্যাপার মশাই, বাবা গাঙ্গুলী বিয়ের কার্ডে মেয়ের পদবী হাসান আর এই দিকে মেয়ের বাবা বলছে সব ঠিক আছে। এর মধ্যে চায়ের ভাঁড় শূন্য হয়েছে। এক গাল হেসে প্রশান্তবাবু আরও দুটো চায়ের অর্ডার দিয়ে বললেন, “হাতে সময় আছে আপনার?”

— হ্যাঁ তা আছে, এখন তো সবে বিকেল পাঁচটা বাজে, আমি তো সন্ধ্যে ৭ টার আগে বাড়ি ঢুকি না।

— তবে শুনুন একটা গল্প বলি। অতুল সেন চোখ দুটো রসগোল্লার মতো পাকিয়ে বললেন, ‘গল্প?’

— হ্যাঁ গল্পই তো বটে।

— আচ্ছা বলুন তবে।

*## ##* *## ##*

সময়টা ছিলো ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস। আমার হঠাৎ পোস্টিংএর নির্দেশ আসে কাশ্মীরে। পরের মাসেই আমাকে সেখানে পৌঁছাতে হবে। তখন আমি থাকতাম ব্যারাকপুরে। আমার আদি বাড়ি সেখানেই। প্রথমে ঠিক করলাম একাই যাবো। কিন্তু তারপর আপনার বৌদি বেঁকে বসল। সে

বায়না ধরল আমার সাথে যাবে। বাড়ির লোকজন অনেক বোঝালো এই ছোটো বাচ্চা নিয়ে কি করে যাবি! তখন আমার ছেলের বয়েস ওই তিন বছর হবে। কথার মাঝেই প্রশান্তবাবুকে থামিয়ে অতুল সেন বললেন, "আপনার ছেলে? মশাই আপনার তো এক মেয়ে!" প্রশান্তবাবু এক গাল হেসে বললেন, "গল্পের মাঝে আটকে দিলে হবে না যে, পুরোটা শুনুন।"

— আচ্ছা বলুন।

প্রশান্ত বাবু আবার বলা শুরু করলেন। শেষ অবধি গিন্নির জেদের কাছে হার মানলাম। স্বপরিবারে বউ বাচ্চা নিয়ে হাজির হলাম জম্মুতে। সব কিছু গুছিয়ে গাছিয়ে স্থায়ী হলাম, ধীরে ধীরে অনেক পরিচিত বাড়ল। আমাদের ক্যাম্পে সব আর্মি পরিবারের মধ্যে আমরাই ছিলাম এক মাত্র বাঙালি। আমাদের পাশের কোয়ার্টারসে ছিলেন আমার এক সহকর্মী আব্দুল হাসান। তাঁর পরিবারে ছিলেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী। আমার সাথে তাঁর বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। কিন্তু আমার স্ত্রী ছিলেন একটু গোঁড়া আর নাক উঁচু। বন্ধুত্ব হলেও তিনি তাঁর বাড়িতে জল অবধি খেতেন না। সরাসরি না করতেন না, কিন্তু এড়িয়ে চলতেন। ওরাও হয়তো বুঝতে পারত। কিন্তু এমনি বাকি সব ঠিকঠাক চলছিল। একে অপরের ঘরে যাতায়াত ছিল। আমরা যাওয়ার পরই দেখেছিলাম আব্দুলের স্ত্রী অন্তসত্ত্বা। মাস তিনেক পর ওদের

একটা ফুটফুটে মেয়ে হলো। আব্দুলের কাছে জেনে ছিলাম ওদের কোনো আত্মীয় স্বজন ওদের সাথে সম্পর্ক রাখে না। ছোটোবেলা থেকেই আব্দুলের মা বাবা ছিলো না, চাচা-চাচীর কাছে মানুষ কোনো রকমে। চাকরি পাওয়ার আগে থেকেই সম্পর্ক খারাপ ছিল। তারপর আব্দুল প্রেম করে বিয়ে করে বসে, আর এই জন্য ওদের বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এমনকি বিলকিসের বাড়ির লোক মানে আব্দুলের শ্বশুর বাড়ির কেউ অবধি ওদের সাথে যোগাযোগ রাখে না। তাই যথারীতি বাচ্চা হওয়ার পর কেউ দেখতে আসা তো দূর খোঁজ অবধি নেয়নি। সেই সময় আমার গিন্নীর বুঝি একটু মায়া হয়, সে বিলকিস আর ওর সন্তানের দেখাশুনা করতে শুরু করে বেশ যত্ন নিয়ে।

##

সময়টা ছিলো ডিসেম্বর মাস জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছিল। আর কাশ্মীরে তখন বরফ পড়ছে। আর্মি ক্যান্টিন থেকে আমাদের সমস্ত দরকারী জিনিস পৌঁছে দেওয়া হতো কোয়ার্টারসে। ডিউটি ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু তবুও বিশেষ কিছু জিনিস তো কেনাকাটির দরকার পড়ে। কি বার মনে নেই আমার অফ ডিউটি ছিলো। গিন্নি বললো, “একটু বাজারে যাবে।” কিন্তু মুশকিল এই ঠান্ডায় বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে বেরোনো যাবে না। তাই তাকে আব্দুলের বাড়িতে রেখে যাবো ঠিক

করলাম। ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার। ওর বাড়িতে ছেলে রাখতে গিয়ে দেখি আব্দুলও বাড়িতে।। সেদিন ছিলো ওর নাইট ডিউটি। আমাদের ছেলেটাও আব্দুলের খুব ন্যাওটা হয়েছিলো। কোনো কান্নকাটি না করে থেকে গেল। এই বলে প্রশান্তবাবু একটু থামলেন। অতুল বাবু বেশ আগ্রহের সুরে বললেন, "তারপর কি হলো গাঙ্গুলী বাবু?"

চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে প্রশান্তবাবু আবার বলতে শুরু করলেন। সেদিন আমাদের ফিরতে একটু দেরী হয়েছিল। কিন্তু সেই দেরী হওয়া যে এতো বড় অভিশাপ হয়ে নামবে বুঝতে পারিনি, আসলে সেটা অভিশাপ না আশীর্বাদ জানি না। কারণ আজ আমাদের ছেলে আমাদের কাছে নেই। কিন্তু আমরা তো বেঁচে আছি। বলেই চোখের কোণে জমা জলটা আঙুল দিয়ে মুছে প্রশান্তবাবু আবার বলা শুরু করলেন। বাড়ি ফিরে দেখি, কোয়াটার চত্বরে লোকজনের ভিড়, পুলিশ মিলিটারি ছড়াছড়ি। আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে?"

আমাকে দেখে একজন জুনিয়ার স্যালুট জানিয়ে বললেন, "স্যার কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা টেরোরিস্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। কোনোভাবে ওরা পেছনের জঙ্গল ভেঙে পাঁচিল টপকে ঢুকে পরেছিল আর কোয়াটারের সকল পরিবারের উপর হামলা চালায়। চারজন অফ ডিউটি সোলজারসহ তাদের পরিবার আর বাকি সকল পরিবারের সকলেই মারা যায়।"

কথা শুনেই আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল আমার স্ত্রী, সব কথা শুনে ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। লেডি কনস্টেবল তাকে ধরাধরি করে মুখে চোখে জল দিচ্ছিলো। কিছুক্ষণ বাদে আমার স্ত্রীর জ্ঞান ফেরে। তখন বাকি কোয়াটারের সকলের বডি একে একে গাড়িতে তোলা হচ্ছে। আমরা ছুটে যাই আব্দুলের ঘরে, গিয়ে আমি আর আমার স্ত্রী আমাদের সর্বনাশের শেষ খেলাটা দেখি। বারান্দা থেকে ঘর অবধি ছড়িয়ে আছে রক্ত আর চৌকাঠে সামনেই পরে আছে আব্দুলের রক্তাক্ত দেহটা। দেখেই বোঝা যায় শেষ নিঃশ্বাস অবধি লড়ে গেছে ছেলেটা বীর যোদ্ধার মতো। আমার চোখ ভেঙে কান্না আসছিলো তবুও নিজেকে সামলে রেখেছিলাম অনুর কথা ভেবে।

তারপর ভেতরের ঘরে গিয়ে দেখি সোফার উপর উবু হয়ে পরে আছে বিলকিসের দেহ। আমার চোখ তখন আমার সন্তানকে খুঁজছে। ভেতরে ঘরে গিয়ে দেখলাম দুইজন পুলিশ আর সাথে একজন লেডি কনস্টেবল। আব্দুলের এক মাসের ছোটো মেয়েটিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে কান্না থামানোর চেষ্টা করছে। এর মধ্যে একজন পুলিশ আমাকে বললেন, “স্যার যখন ঘটনা ঘটে তখন বোধ হয় বাচ্চাটা ঘুমাচ্ছিল তাই কেউ টের পায় নি।” এর মধ্যে আমার পাশ থেকে আমার স্ত্রী চেঁচিয়ে বললো, “আমার ছেলে কোথায়?” ঘরের মধ্যে বাকি সবাই সবার মুখ চাওয়া

চাওয়ি করছে। তার মধ্যে একজন বললেন, “আর কোনো বাচ্চা তো আমরা পাইনি।” কথাটা শুনে আমি কিছু বলতে যাবো, এরমধ্যে অনু বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। দুইজন পুলিশ তখনই আমার ছেলেকে আশেপাশে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। এরমধ্যে একে একে বডি নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক ঘরে ঢুকল। প্রথমে আব্দুলের বডিটা সরিয়ে নিয়ে গেল। আমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে, অনু পাগলের মতো কেঁদেই চলেছে। এর মধ্যেই ওরা যখন বিলকিসের উবু হয়ে পরে থাকা রক্তাক্ত শরীরটা উল্টে দিল। বিভৎস এক দৃশ্য চোখে পড়ল।

আমার তিন বছরের বাচ্চা ছেলেটিকে দুই হাত দিয়ে বুকের মাঝে আগলে রেখেছে বিলকিস। বোঝাই যাচ্ছিলো ঢাল হয়ে সমস্ত বারুদের আঘাত সে নিজের পিঠে নিয়েছে। সাথে সাথে ওর মৃত হাতের বাধন থেকে ছাড়ানো হলো ছেলেকে। জ্ঞান ছিল না আমার ছেলের কিন্তু হার্টবিট তখনও চলছে। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। একটা গুলিও ওর লাগেনি। কিন্তু ডানপায়ের উরু ঘেঁষে একটা বুলেট বেরিয়ে ছিলো সেটাই ওর পায়ে অনেকটা ক্ষত সৃষ্টি করে রক্ত ক্ষরণ হয়েছিল প্রচুর। টানা তিনদিন যুদ্ধ চললো হাসপাতালে। কিন্তু শেষ অবধি তাকে বাচাঁনো গেলো না। এই অবধি বলে চুপ করলেন প্রশান্ত বাবু। অতুলবাবু আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেলেন না।

একজন রাফ এ্যান্ড টাফ আর্মি ম্যানের চোখে এই প্রথম জল দেখে উনিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন।

প্রশান্ত বাবু আবার বলা শুরু করলেন, "আব্দুলের পরিবারকে খবর দেওয়া হল। তাদের বাচ্চাটির ব্যাপারে। আব্দুল এবং বিলকিস দুইজনের পরিবার ওই বাচ্চার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে দিল। বাচ্চাটি তখনও হাসপাতালের অধীনে। আমি কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না! আমার স্ত্রীও সন্তান শোকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। এমনি এক সন্ধ্যায় হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে অনু, শরীর সুস্থ হলেও মনের ক্ষত কি মেটে এতো দ্রুত? সন্তান শোক যে কি যন্ত্রণা! আমি নিজেকে তখন শক্ত রেখেছি, কারণ আমি ভেঙে পড়লে অনুকে বাঁচানো দায়। কিন্তু কষ্টের পাহাড় তো আমার বুকেও ভেঙেছে। একজন ডাক্তার এসে আমাকে বললেন, "খবরটা পেলেন স্যার?"

— কি খবর?

— আব্দুল স্যারের বাচ্চাটিকে কাল একটা অনাথ আশ্রমে শিফট করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

— সেকি? ওর বাড়ির লোক কেউ বাচ্চাটিকে নিতে চায়নি?

— না স্যার। ওরা বলছে ওদের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিলো না, তাই ওই বাচ্চার দায় ভার ওদের না।

আমি কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। এর মধ্যে অনু বেড ছেড়ে উঠে বললো, "আমাকে ওই বাচ্চাটির কাছে নিয়ে যাবেন একবার?"

ডাক্তার ব্যাস্ত হয়ে বললেন, “ম্যাডাম উঠবেন না, আপনি এখনও অসুস্থ।”

— না না আমি পারবো

এই এতো দিনে অনু প্রথম কথা বললো। আমি আর ডাক্তার অনুকে ধরে ধরে নিয়ে গেলাম বাচ্চাদের ওয়ার্ডে। একটা সাদা বিছানায়, সাদা কাপড়ে মোড়া ছোট্ট একটা পরী বুক ফাটিয়ে কাঁদছে দেখে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। অনু এগিয়ে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিল। অনুর কোল পেয়ে বাচ্চাটা কেমন যেন শান্ত হয়ে গেল। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে অনু আমার দিকে তাকিয়ে ভেজা গলায় বললো, “হ্যাঁ গো ওকে আমরা নিয়ে যেতে পারি না আমাদের সাথে?” আমার মুখের ভাষা বন্ধ হয়ে গেছিল।

সমস্ত কিছু অফিসিয়াল ফর্মালিটি মিটিয়ে ওই ছোটো পরীকে নিয়ে আমরা ফিরে আসলাম বাড়ীতে মানে ব্যারাকপুরে। বাড়িতে সব ঘটনা জানানোর পর পরিবারের বাকি সবাই, মানে আমার মা, বাবা, দাদা, বৌদি বেঁকে বসল। মুসলিমের সন্তান এই ব্রাহ্মণ পরিবারে কোনো ভাবেই স্থান পাবে না। আর তার সাথেই চললো অনুকে গাল মন্দ করা। সে যদি জেদ না করে যেত, তবে আমাদের সন্তান আজ বেঁচে থাকতো। আমাদের সন্তানের মৃত্যুর জন্য অনু দায়ী। আমি মেনে নিতে পারিনি অনুর অপমান। বাড়ি ছেড়ে ছিলাম সেই মুহূর্তে। আমার মা অনুকে বলেছিলেন,

“অন্য ধর্মের রক্ত তুমি নিজের করে মানুষ করতে পারবে? মনে হবে না ও তোমার রক্ত নয়।”

অনুর জবাব সেদিন আমার বুকটা গর্বে ভরিয়ে দিয়েছিলো। “মাতৃত্বের কোনো ধর্ম হয় না, মা। একজন বিধর্মী মহিলা যদি আমার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য নিজের বুকে আগলে মৃত্যু বরণ করতে পারে। আর আমি তার সন্তানকে বুকের দুধ খাইয়ে জীবন দিতে পারবো না?” বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার সময়, বড়দা এসে আমাকে বললেন, “কার না কার বাচ্চা তার জন্য নিজেদের মানুষকে ছেড়ে যাবি?”

— দাদা ও আমার সন্তান – আমাদের সন্তান... যে বাড়িতে তাদের সন্তানের স্থান নেই, সেইখানে মা-বাবা কি করে থাকে বলো? সমস্ত সম্পর্কের শিকল ভেঙে ওই ছোট্ট শিশুটির মুখের দিকে চেয়ে আমি মুক্তির স্বাদ পেয়েছিলাম সেদিন।

মাটির ভাঁড়টা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রশান্তবাবু বললেন, “তারপর চলে আসি এই যাদবপুরে।” বাচ্চাটির নামকরণ করে যেতে পারেনি আব্দুল আর তার স্ত্রী। তাই অনু ওর নাম রাখলাম ঈশানী। আমাদের ছেলের নাম ছিলো ঈশান। তাই অনু বললো, “ঈশানের পর যদি আমার কোনো সন্তান হতো আর সে যদি মেয়ে হতো আমি তার নাম ঈশানী রাখতাম, তাই ওর নাম ঈশানী ই থাক।”

আমিও খুশি হয়েছিলাম কিন্তু ওর পদবী আমরা পাল্টাইনি। কাগজে কলমে ওর নাম আগাগোড়াই ঈশানী হাসান। অনু সিদ্ধান্ত নিলো আর কোনো সন্তান আমরা নেবো না। কারণ ওর ভয় ছিলো যদি আরো একটি সন্তান এলে ওর মমতা কমে যায় ঈশানীর প্রতি। তবে আমার বিশ্বাস ছিলো সেটা হতো না, কারণ আমি অনুকে চিনি। তবে আমিও জোর করিনি আর সন্তানের জন্য। প্রাপ্ত বয়েসে পা রাখার পর আমরা সমস্ত কিছু ঈশানীকে জানাই। সব শুনে মেয়ে বললো, “বাবা আমি জানি না কে আমার জন্মগত মা-বাবা, কি বা আমার ধর্ম। শুধু এইটুকুই জানি তোমরা আমার মা-বাবা আর তোমাদের ভালোবাসা আমার কাছে পরম ধর্ম।” কথা শেষ করে, প্রশান্তবাবু অতুল সেনের দিকে তাকালো। অতুল সেনের চোখ দুটো তখন ছানা বড়া। বিয়ের কার্ডটা ভাঁজ করে অতুল বাবু বললেন, “পাত্র পক্ষ সব জেনে শুনেই...”

ওনার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রশান্ত বাবু বললেন, “ঈশানী যখন আমাকে বলে, যে সে একটি ছেলেকে ভালোবাসে তাকে বিয়ে করতে চায়। একটু চিন্তায় পরেছিলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, “তা সে তোমার ব্যাপারে সবটা জানে তো?”

— হ্যাঁ বাবা অমিত সবটা জানে। ওর কোনো আপত্তি নেই।

আমি ছেলের বাড়ির লোকজনকে ডেকে পাঠালাম। তখনও আমার চিন্তার বোঝা কিছু হালকা হয়নি। কারণ ছেলে রাজী থাকলেও তার পরিবার সেটা কতটা মেনে নিচ্ছে সেটা ভাববার বিষয়।

— দেখুন ছেলে মেয়ে একে অপরকে পছন্দ করেছে সেটা তো ঠিক, ওদের পছন্দই আসল। কিন্তু পরিবার ছাড়াও তো আমাদের চলে না। তা আপনারা জানেন তো ঈশানী...

আমার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই ছেলের মা বললেন, "সব জানি অমিত আমাদের সব বলেছে। সব জানার পর থেকে আমি আর অমিতের বাবা অপেক্ষা করছিলাম কবে অনসূয়া দেবী আর আপনাকে সামনে থেকে দেখবো। সত্যিই আপনারা মানবতার এক অন্য রকম উদাহরণ গড়েছেন... "

অনু বললো, "না না এইগুলো কি বলছেন, আমাদের কাছে একটাই সত্যি ঈশানী আমাদের সন্তান আর সন্তানের প্রতি মা-বাবার যা কর্তব্য সেটাই আমরা করেছি।" এর মধ্যে ছেলের বাবা বললেন, "সত্যি বলতে আমরা একটু টেনশনে ছিলাম।"

আমি বললাম, "সেকি টেনশনে থাকার কথা আমাদের, আপনি কেনো টেনশনে থাকবেন?"

— না আসলে একটাই চিন্তা ছিলো অমিতকে আপনাদের পছন্দ হবে কিনা? আপনার পরিবারের মেয়ে আমার ঘরের

পুত্রবধূ হবে এটা আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু আমাদের ছেলে তার যোগ্য কিনা সেটা তো একটা ব্যাপার তাই না...

এই অবধি বলে একটু হাসলেন প্রশান্তবাবু আর বললেন, "তবে অতুলবাবু উঠি আজ। বিয়েতে কিন্তু স্বপরিবারে আসা চাই।"

অতুল সেন প্রশান্তবাবুর হাত ধরে বললেন, "গাঙ্গুলীবাবু, নিশ্চই যাবো।" চোখের জল মুছে অতুল সেন আবার বললেন, "সত্যি ভাই, আজ বড় গর্ব হচ্ছে এটা জেনে যে আমি এমন একজন মানুষের বন্ধু।"

##

কাল ঈশানীর বিয়ে, বাড়ি সেজে উঠেছে রঙিন আলোতে। প্রশান্তবাবু তাঁর এক বন্ধুর শ্যালককে বললেন, "কি হে যদু কাজী সাহেবকে বলে এসেছো তো ঠিক ঠিকভাবে। বিয়ের লগ্ন কিন্তু ৯.৪০ এ তার আগে কিন্তু নিকাটা কমপ্লিট করতে হবে।"

ঈশানী বাবাকে ডেকে বললো, "বাবা ঠাকুরমশাই বললেন, সকালে ৮ টার সময় আসবেন।" এর মধ্যে ঈশানির মাসির ছেলে এক হাতে পাঞ্জাবি আর এক হাতে একটা সেরওয়ানি নিয়ে হাজির।

— মেসো দেখো তো রং দুটো ঠিক আছে?

প্রশান্ত বাবু এক মুখ হাসি নিয়ে বললেন, "একদম পারফেক্ট।"

বড়োগল্প

রাত ২টা বেজে ৩০ মিনিট, প্রশান্তবাবু ছাদের এক কোনায় দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান দিচ্ছিলেন।

— বাবা ঘুমতে যাবে না? কাল তো অনেক ভোরে উঠতে হবে?

হঠাৎ ঈশানির গলা পেয়ে সিগারেট টা ফেলে দিয়ে বললেন, "এইদিকে আয়।" মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে প্রশান্তবাবু বললেন, "কাল তোর বিয়ে আর পরশু দিন এই বাড়িটা ফাঁকা করে এই বুড়ো ছেলেটাকে ছেড়ে চলে যাবি। তা আমার বুঝি ঘুম আসবে?" ঈশানি চোখের জল আটকাতে না পেরে বাবার বুকে মুখ গুঁজে বলে, "করবো না আমি বিয়ে, সব বন্ধ করে দাও। এই ভাবে তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারবো না বাবা।"

— ধুর পাগলী মেয়ে, এটাই তো সমাজের নিয়ম বিয়ে করে মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে।

— মানি না এই নিয়ম।

— আচ্ছা শোন তোর মাকে একটু বুঝিয়ে যাস যেন বেশী চিন্তা না করে।

— মাকে তো বোঝাবো, কিন্তু তুমি আগে বলো আর সিগারেট খাবে না।

— আচ্ছা দিনে একটা খাবো।

— না একটাও না।

— আজকেও এমন করে শাসন করবি?

— সারাজীবন করবো। তুমি কি ভাবলে বিয়ে হচ্ছে বলে পার পাবে, আমি রোজ আসবো বাড়িতে।

— আচ্ছা বাবা নে আর খাবো না.....

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ বাবা মেয়ের এই আবেগপ্রবণ অনুভূতির সাক্ষী হয়ে নিজের বুকে লিখে রাখছে এক অন্য মুক্তির গল্প। ■

প্রিয়তমাসু

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

যদিও তোমার সাথে আজও দেখা হয়নি
তবুও তোমার চোখে চোখ রেখে হারিয়ে যাবার
ইচ্ছাটা
দিন দিন প্রবল হচ্ছে...
অথচ জীবনের জটিলতা কেমন যেন
দিন দিন তোমাকে
আরও দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে...

কবিতায় আমরা এক,
গানের সুরে আমরা অভিন্ন...
মাছ, ভাত আর বেগুন পোড়া,
দু'জনেরই পাতায় ভরা...

তাহলে আমরা ভিন্ন হলাম কেন?
এক শীর্ণ ইছামতী-রেখা
আমাদের চিরতরে করে দিল বিচ্ছিন্ন...
আর আমরা কপাট বন্ধ করে
বাধ্য বাছুরের মত

কবিতা

স্বাধীনতার ললিপপ চোষা লালা ঝরাতে ঝরাতে
বসে রইলাম যে যার ঘরে...

আমি জানিনা –
তুমি জানকী কি জাহানারা,
আর আমি তোমার রাম না রহ্‌মন...
শুধু জানি আমরা দুজনেই
আজ দিশাহারা...

অচেতন অভিমানের মূর্খ বিলাসে
আজও বিপন্ন আমাদের সংস্কৃতি...
শতাধিক বর্ষ তার কাল (কালো!) স্রোতে
ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এক শীর্ণ ইছামতী...

চেয়ে দেখ প্রিয়তমা
এসেছে সময়...
এখন ইছামতী শুধুই পলিময়,
কার ক্ষোভ, কার দোষ,
কার লোভ, কার রোষ,
থাক সে সব নুড়ি পাথরের রেষারেষি...
এসোনা, আর একবার স্থির হয়ে
চোখে চোখ রেখে, বসি পাশাপাশি। ■

কাশফুল

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

শরতের নীলাভ শুভ্র আকাশ। আকাশে ঢেউ খেলে যায় সাদা মেঘ। সেই সাদা মেঘে ঢেউ খেলে যায় এই জনপদের মানুষের মনে। প্রকৃতির এমন স্নিগ্ধ রূপ মন ও মননে আনন্দের লহর বইয়ে যায়। দু'কদম হাঁটলেই ঘৃলাই নদী চোখে পড়ে। কাশফুলে ছেয়ে গেছে নদীর দুপাশ। আকাশের শুভ্রতা আর কাশফুলের সাদা রং মিলেমিশে একাকার – যেমনটা একাকার হয়ে গড়ে উঠেছে আজন্মের মেলবন্ধনে এ জাতি। নদীর বাঁকে বাঁকে যে সৌন্দর্যের ঢেউ খেলে যায় তা যেন এই বাংলার রূপেরই বহিঃপ্রকাশ। আমি বলি, "ও নদী কোথায় যাও?"

নদী ঢেউ খেলে বলে, "যে জনপদ আমাকে 'নদী মাতৃকা' সম্বোধন করে, সেই পথেই আমি হাঁটি।"

আমি বলি, "আমায় নাও না তোমার সঙ্গে।" ঢেউয়ের উচ্ছল তরঙ্গ বলে, "আজন্ম ছুটে চলা যার ব্রত; ছোটাতেই তার আনন্দ; ছুটতে পারলে চলো গো চলো..."

দূরে একটা পাল তোলা নৌকো দেখা যায়। মাঝি মনের সুখে গান গাইতে থাকে ভাটির গাঙ্গে। দূরে নদীর ঘাটে নাইতে নেমেছে হরিদাসী। এমন দৃশ্য দেখে হরিদাসীর

বাবার বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। মনের অজান্তে বাজতে থাকে 'কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া; আমার ভাই ধনরে কইও নাইয়র নিতো বইলা...'

হরিদাসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "এইবারও বাপের দ্যাশে যাওয়া হলো না! বাবা-মা যদ্দিন থাকে তদ্দিনই নাইর যাওয়া হয়। একবার সেই পাট উঠে গেলে কে কার খবর রাখে!"

বিকেলে মাটির ঘর লেপতে থাকে হরিদাসী। মাটির ঘরে লতাপাতা আঁকে সে। নকশী কাঁথায় যেসব স্বপ্ন সে আঁকে তারই একটা প্রতিফলন দেয়ালচিত্রে দেখা যায়। আর কিছুদিন পরেই দুর্গাপূজা। আজকের মধ্যেই ঘর লেপা শেষ করতে হবে। এরপর নাড়ু, মোয়া, সন্দেশ তৈরি করতে হবে। ছেলে-মেয়ে দুটোর জন্য নাড়ু মোয়া পূজার আগে বানানোর জো নেই। পূজা না আসতেই ওরা সব পেটে চালান দেয়।

সকাল থেকে টইটই করে বেড়াচ্ছে হরিদাসীর দুই ছেলেমেয়ে অর্ণব আর ঊর্মি। আজ ছুটির দিন। স্কুল থাকলে তবুও কিছুটা স্বস্তি মেলে। আজ আর ওদের কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। অর্ণব ঊর্মিকে বলে, "আজ কাশফুল তুলতে যাবি?"

— চল

— আচ্ছা দাদা, কাশফুল এই সময় ফোটে কেন?

— বাঃ রে এটাও জানিস না। কয়েকদিন পরেই দুর্গাপূজা; মা দুর্গা এই কাশ ফুলের গয়না পরে বাবার বাড়িতে আসবে

— দেবীরা বুঝি কাশফুলের গয়না পরে?

— পরে না আবার! না পরলে কি আর এই সময় কাশফুল ফোটে!

দুজনে কাশফুল তুলতে যায়। অর্ণব ঊর্মিকে কাশফুলে সাজিয়ে দেয়। যেন নিজ হাতে দেবী দুর্গার গায়ে গয়না পরাচ্ছে অর্ণব। কাশফুলের গয়না পরে ঊর্মি হরিদাসীকে দেখায়। কাশফুল দেখে হরিদাসীর অতীত মনে পড়ে। সেবারও এমনই একখণ্ড আকাশ ছিল। ছিল শরতের শুভ্রতা। মনে আতঙ্ক ছিল। এই বুঝি মরে যাচ্ছি বলে আশঙ্কা ছিল। বেঁচে মরে থাকার মতো এক অদ্ভুত সময়। সবাই এক এক করে ভারতে চলে যাচ্ছিলো। বাড়ির গরুটাও হাতে ছিল। ছেড়ে যাওয়ার আগে অঝোরে কাঁদছে এই গ্রামের মানুষ। কখনো ঘরের খুঁটি ধরে কখনো গরুর গায়ে হাত বুলিয়ে। কিন্তু, হরিদাসীর বাবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, এদেশ ছেড়ে কখনোই যাবে না। বাঁচলে বাঁচবে মরলে এই দেশেই মরবে।

যুদ্ধের মাঝামাঝি, হরিদাসী দাদার সঙ্গে কাশফুল তুলতে যায়। ঘৃলাইয়ে তখন ভরপেট জল। নদীর চরে মৃদু বাতাস লেগে কাশফুল দুলছিল। দাদা একটা একটা করে কাশফুল তুলে হরিদাসীর হাতে দিচ্ছে। হরিদাসী সেটা গুনে রাখছে।

হঠাৎ হরিদাসী লক্ষ্য করলো, নদীর পাড়ে একটা নয় দুটো নয় তিনটে মানুষ। মৃত মানুষ, বিবস্ত্র। গলা-পচা মানুষ। পুরো শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শিউরে ওঠে হরিদাসী, চিৎকার করে বলে, দাআআদা...

হাতের ইশারায় দাদাকে দেখায় হরিদাসী। দুজনে এক ছুটে বাড়ির পথে রওনা দেয়। হঠাৎ গোলাগুলির শব্দ। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ আগেই সীমানা টপকে ভারতে চলে গেছে। ফলে, গ্রামে ঢুকে ফাঁকা গুলি চালিয়ে পাকিস্তানি সেনারা গ্রাম ত্যাগ করে। গুলির শব্দে কুঁকড়ে ওঠে ওরা ভাইবোন। ভাগ্যিস ওর বাবা-মা সেদিন ঘরে ছিল না। গরু নিয়ে মাঠে ছিল তাই প্রাণে বেঁচেছে।

বাড়ি ফিরে দেখে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে আছে। মা-বাবাও ছুটতে ছুটতে ঘরে ফেরে। জড়িয়ে নেয় হরিদাসী ও দাদাকে। এমন দৃশ্য দেখে অন্তরিক্ষ থেকে যমদূতও হয়তো হাততালি দিলেও দিতে পারে। কাশফুলের শুভ্রতার আঁচলকে অবলম্বন করে মায়ের শাড়ির আঁচলে মুখ লুকায় হরিদাসী। সেই আঁচলটাই আমাদের আজন্ম ভরসা দিয়ে আসছে অনাদিকাল ধরে। ■

অবচেতন মন

ফাল্গুনী গিরি মন্ডল

লমারির প্রতিটা শাড়ি যখন ছুঁয়ে যাই,
তোরই আঙুলের ঘ্রাণ সেখানে খুঁজে পাই।

আমার একলা মনের হলুদ ক্যানভাস জুড়ে,
চির সবুজ ভালোবাসা প্রজাপতি হয়ে ওড়ে।

অবচেতন মন আজ কেন যে অযুত উল্লাসে,
আলপনা কাটে অনুভূতির জমানো নিশ্বাসে।

হঠাৎ দমকা হাওয়া ফেরায় যে সম্বিৎ--
বিবর্ণ হয়ে মুছে যায় যত কিছু হরিৎ।

অন্ধকার ছুঁয়ে গেছে আমায় ভালোলাগার ঘর,
সুখী মুহূর্তেরা কেন জানিনা হয়ে যায় পর।

মনে পড়ে বৃষ্টি ভেজা সেই কোন এক রাতে,
কালির দোয়াত উপুড় হয়েছিল জীবনের ধারাপাতে।

রেখে গেলে না বলা এক অসীম শূন্যতা,
হৃদ মাঝারে সেই থেকেই মোমের নীরবতা।

কবিতা

মায়ার সুতোয় গাঁথা সাজানো বর মালা,
ভুল বুঝে চলেই গেলে করে অবহেলা।

ন্যুব্জ স্নায়ুরা ফিসফিসিয়ে আজও রোজ কথা বলে,
স্মৃতিরা জড়ো হয়ে আমায় কোন সুদুরে নিয়ে চলে। ■

যোদ্ধা

পত্রালিকা বিশ্বাস

চার বছরের একরত্তি তিথির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতেই সৃজনী মনে মনে ভাবতে থাকে, সিদ্ধান্তটা ভুল হচ্ছে না তো, অনেক কিছু নির্ভর করে আছে এই একটা সিদ্ধান্তের ওপর। এই বাচ্চা মেয়েটা যদি বাবা-মা দুজনকেই হারিয়ে ফেলে, তবে কি হবে? কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কার কাছে থাকবে তিথি?

ভাবতে ভাবতে কেমন যেন মাথাটা ধরে আসে সৃজনীর, অনেকক্ষণ তিথির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর যখন রঞ্জনের দিকে চোখ পড়ে, মনে হয় কি শান্তিতে ঘুমাচ্ছে মানুষটা। আজকে দুপুরেও কত কষ্ট পাচ্ছিলো, ওষুধটা পড়তে একটু শান্তি পেলো। রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় এর থেকে ভালো সিদ্ধান্ত বোধহয় আর হয়না।

তারপর একটু জল খেয়ে বিছানায় শুতেই চোখে পড়ে দেওয়ালে লাগানো ওদের বিয়ের ছবিতে, ডাক্তার আজকেও বললেন এমন করে আর বেশিদিন চলবে না। রঞ্জনের শারীরিক অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে। বিয়ের পর থেকে সব ঠিক চলছিলো, তারপর তিথি এলো ওদের জীবনে, সময়টা বেশ স্বপ্নের মত বয়ে চলছিল। হঠাৎই বছর দেড়েক

হলো প্রথমে মারাত্মক জন্ডিস ধরা পড়ে রঞ্জনের, আর তারপর বাকি লক্ষণগুলো দেখে ডক্টর দেখিয়ে ডায়াগনোসিস করতেই ধরা পড়ে রঞ্জনের সিরোসিস অফ লিভার, আর ধরা পড়ার মুহূর্তেই রোগ বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। প্রথম থেকেই ডক্টর বলে এসেছেন লিভার প্রতিস্থাপন ছাড়া খুব বেশিদিন ওষুধে কাজ দেবেনা, আর দেরি হলে সমস্যা আরো জটিল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তারপর থেকেই সৃজনী আর রঞ্জনের জীবনে অন্ধকার অধ্যায়ের শুরু।

দেড় বছর হতে চললো রঞ্জনের লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য কোন ডোনার পাওয়া যায়নি, আর ওষুধেও আজকাল আর কাজ দিচ্ছে না। ওজন কমতে কমতে শীর্ণকায় রঞ্জন বিছানায় শুয়ে থাকলে যেন লেপ্টে থাকে চাদরের সাথে, কথাবার্তায়ও আজকাল অসংলগ্ন বেশ, শরীরটা যেন এদিক থেকে ওদিকে টেনে নিয়ে যায় কোনরকমে।

ডাক্তার আর বাড়ি করতে করতে হাঁফিয়ে উঠেছে সৃজনী নিজেও, কিন্তু হার মানলে যে চলবেনা তাই এই সিদ্ধান্তটাই একদম সঠিক বলে মনে হচ্ছে সৃজনীর। এরকম চলতে চলতে হঠাৎ যদি হারিয়ে ফেলে রঞ্জনকে, না না কিছুতেই এ হতে দেওয়া যায়না, তার থেকে বরং নিজেই একবার রঞ্জনের সাথে লড়াইএর ময়দানে নেমে দেখাই যাক না কি হয়। আজকে অনেকবার ভেবেছিল সৃজনী রাতেই রঞ্জনকে বলে দেবে কথাটা, তবে আগের থেকেই যদি রঞ্জন বাধা

দেয় তাই বাড়ির কাউকে না জানিয়েই সৃজনী ঠিক করে ফেলেছে কাল একবার ডক্টরকে ফোন করে সিদ্ধান্তটা জানাবে। আর ডক্টর যদি রাজি হয়, তাহলেই রঞ্জনকে জানিয়ে দেবে সবটা। সারা রাত এসব কথাই মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো, ঘুম আর এলো না সৃজনীর।

সকালে উঠেই হসপিটালে ফোন করে ডক্টরের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয় সৃজনী, তারপর কিছু জরুরী কাজ আছে বলে বেড়িয়ে পরে সময় মতো। ডক্টরের চেম্বারে তখন বসে আছে সৃজনী, ডক্টর নিজেই বলে উঠলেন সব শুনে, “আপনি কিন্তু ভেবে বলুন মিসেস মুখার্জী, এটা কিন্তু একটা লং প্রসেস, খানিকটা এগিয়ে পিছপা হলে কিন্তু খুব মুশকিল হবে। আপনি পারলে আরো একবার ভেবে নিয়ে জানান আমায়।”

— আমি ভেবে নিয়েছি ডক্টর। প্লিজ আপনি বলুন আমায় কি করতে হবে?

— তাহলে আপনিই লিভার ডোনেট করতে চাইছেন আপনার হাসব্যান্ডকে। আরেকবার ভেবে নিন মিসেস মুখার্জী। আপনার একটা চার বছরের বাচ্চা আছে। সবদিক ভেবে বলুন।

— আমার সবকিছু ভাবা হয়ে গেছে ডক্টর। প্লিজ আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব... আমি যে আর এভাবে দেখতে পারছিনা রঞ্জনকে। রোজ চোখের সামনে দেখছি ও একটু একটু করে

মৃত্যুর খাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন ধরেই আর যেন নেওয়া যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে আমি বোধহয় ওকে হারিয়ে ফেলবো যখন-তখন।

— শান্ত হোন মিসেস মুখার্জী। এটা ভেঙে পড়ার সময় নয়। আপনাকে আরো অনেক শক্ত হতে হবে আজ থেকে। আপনি একটু বসুন, আমি ভেতর থেকে একটু কথা বলে আসছি। যত তাড়াতাড়ি আপনার কিছু রুটিন টেস্ট করিয়ে নেওয়া যায়, তারপর রিপোর্ট এলে নয় আমি বলতে পারবো, আপনি মিস্টার মুখার্জীকে লিভার ডোনেট করতে পারবেন কিনা। আপনার এমনি কোন ক্রনিক ডিসিস আছে কি? মানে ওই সুগার, প্রেশার বা অন্যকিছু?

— না ওসব কিছু নেই। বলছি ডক্টর কতদিনের মধ্যে জানতে পারবো?

— এই উইকটা ধরে চলুন। আমরাও চেষ্টা করবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...বেশি টেনশন করবেন না। হোপ ফর দি বেস্ট।

সেদিনের মত টেস্টের দিন, সময় সব জেনে চলে এসেছিল সৃজনী, আর তারপর বাড়িতে সবাইকে রোজই কিছু না কিছু বলে বেড়িয়ে টেস্টগুলো করিয়ে নিয়েছে। আজ সকাল থেকেই টেনশনে এক জায়গায় বসতেও পারছেনা সৃজনী, মনে হচ্ছে যেন জীবনের সবথেকে বড় পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে চলেছে। রিপোর্টগুলো হাতে না

পাওয়া অবধি যেন দুদণ্ড শান্তি নেই। অবশেষে রিপোর্ট হাতে পাওয়া গেলো, এবং ডক্টরও রিপোর্ট দেখে বললেন সৃজনী যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত, শুধু রঞ্জনের সাথে কথা বলে ডক্টরের কাছে গিয়ে তারও কিছু রুটিন টেস্ট করে দিন ঠিক করার পালা।

সৃজনী সেদিনই রাতে রঞ্জনকে সব বলে। রঞ্জন প্রথমে মানতে না চাইলেও শেষে সৃজনীর জেদের কাছে হার মানে। দুজনেই ঠিক করে তিথিকে সৃজনীর মায়ের কাছে রেখে আসবে কিছুদিনের জন্য আর ওর মাকেও বলতে হবে সব। সৃজনীর মা প্রথমটায় সবটা শুনে একেবারেই রাজি ছিলেন না, কিন্তু তিনিও মেয়ের জেদের কাছে হেরে গিয়ে বুকে পাথর চেপে মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

রঞ্জনের রুটিন টেস্টও শেষ, দিনও ঠিক হয়ে গেলো যথাক্রমে। অপারেশনে যাওয়ার আগেও সৃজনী নার্সের সাথে গিয়ে একবার দেখা করে এলো রঞ্জনের সাথে, আর বললো, কোন ভয় পেওনা, আমিও তো আছি তোমার সাথে। দুজনে একসাথে লড়বো, ভগবানেরও সাধ্যি নেই তোমায় আমার থেকে কেড়ে নেয়। রঞ্জন মাথা নিচু করে সবটা শুনলো আর হাতটা ধরে থাকলো সৃজনীর। বেশ কয়েক ঘন্টার সফল অস্ত্রোপচারের পর যখন দুজনেরই জ্ঞান ফিরে এসেছে একে একে তখন ডক্টর জানালেন সৃজনীর লিভারের ষাট শতাংশ দেওয়া হয়েছে রঞ্জনকে।

কয়েকদিনের বিশ্রাম তারপর দুজনেই সুস্থ হয়ে ফিরতে পারবে ঘরে, তবে কিছু নিয়মের বেড়াজালে থাকতে হবে দুজনকেই আজীবন।

সৃজনীকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে বড্ড কষ্ট হচ্ছে রঞ্জনের, এ যেন নিজের শারীরিক যন্ত্রনার থেকেও কয়েকগুণ বেশি যন্ত্রনার, কিন্তু কৃতজ্ঞতায় চোখের কোণে জল এসে যাচ্ছে বারবার, মনে হচ্ছে এই মানুষটা তাকে পুনর্জন্ম দিল।

বেশ কয়েক সপ্তাহ হসপিটালে কাটিয়ে দুজনেই যখন বাড়ি ফেরার জন্য একদম তৈরি তখন ডক্টর ওষুধপত্র, সব নিয়ম বুঝিয়ে দিয়ে রঞ্জনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, মিস্টার মুখার্জী আপনার যে নবজন্ম হল। দুজনেই ডক্টরের কথায় হাসতে হাসতে বেরোচ্ছে হসপিটাল থেকে, দূরে রিসেপশনের কাছে তখন তিথি দাঁড়িয়ে আছে সৃজনীর মায়ের হাত ধরে, আর ওদের নার্সের সাথে হুইল চেয়ারে বসে আসতে দেখে ছুটে আসে বাবা মায়ের কাছে। তার মধ্যেই বেশ কিছু সাংবাদিক কোথা থেকে খবর পেয়ে মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা নিয়ে চলে আসে ওদের সামনে আর প্রথমেই সৃজনীকে প্রশ্ন করে, “কেমন লাগছে ম্যাডাম আপনার?”

— ভালো তো অবশ্যই। তবে কিছু অনুভূতি বোধহয় শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা যায়না কখনোই।

তারপর, রঞ্জনের দিকে মাইক্রোফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "স্যার আপনি কিন্তু ভীষন লাকি, একজন যোগ্য সহধর্মিণী পেয়েছেন জীবনে।"

— আপনি শব্দটা ভুল বললেন, সহধর্মিণীর থেকেও সহযোদ্ধা শব্দটা বোধহয় ওর জন্য বেশি অ্যাপ্রপ্রিয়েট।

সৃজনীর মা তখন বলে ওঠে, "আমার মেয়ে আর জামাই দুজনেই যোদ্ধা, তাইনা রে দিদিভাই?" তিথিও ঘাড় নাড়িয়ে কিছুটা বুঝেই উত্তর দেয়, "ঠিক বলেছ দিয়ান, যোদ্ধাই তো।" ■

সবিনয় নিবেদন

- ‘অক্ষরাঞ্জলি’ কেমন লাগল আপনারা তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন।
- লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকা আমরা আপনাদের সবাইকেই ‘পাণ্ডুলিপি’তে যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছি। লেখক-লেখিকারা অবশ্যই What’sApp নাম্বারটা লেখার সাথে আমাদের ‘ই-মেল’ এ পাঠাবেন।
- আপনাদের মধ্যে যাঁরা লিখতে পারেন, সিরিয়াসলি লেখেন এবং লেখাটি পাঁচ জনের কাছে পৌঁছতে চান, ‘পাণ্ডুলিপি’ দিয়ে শুরু করতে পারেন।
- আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ এ পাঠিয়ে দিন। আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com।
- আমরা (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। লেখা প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

গুঞ্জন পড়ুন ~৯ গুঞ্জন পড়ান

https://www.facebook.com/groups/183364755538153

ডালিম

অলোক লোদি (বাংলাদেশ)

ডালিম ফুলের নামে নাম তার তানভীর দীবা ডালিম।
কোথায় দেখেছি তারে! হয়তো বা কোন এক নদীর ধারে!
বলেনি তো সে – এতদিন কোথায় ছিলেন?
পাখির নীড়ের মতন
চোখ তুলে যেমন বলেন নাটোরের বনলতা সেন...
সময় গিয়েছ কেটে কত বছরের পার
ত্রিশ বছর তবু কই শেষ হয়!

শেষবার তার সাথে দেখা হয়েছিল যখন বছর কুড়ি আগে,
ঢাকা নিউ মার্কেটের গেটে। শুধালাম কেমন আছো?
সে তো বললোনা কিছুই, বলিলাম, আবার আসিও
আসিবার ইচ্ছা যদি হয, এইখানে এই সময়।

আর একবার দেখা হয়েছিল গুলশান ১ নং গোল চত্বরে
শুধালাম, আপনি কি তানভীর দীবা ডালিম?
বললেন – না। আপনি ভুল করছেন,
আমি অন্য কেউ অন্য কোনোখানের।

কবিতা

সময় গিয়েছে চলে ত্রিশটি বছরের পার,
এখন তাহারে নাই মনে।
হয়তো সে নয়, অন্য কেউ, অন্য কোনোখানের!
তবু আমার মন বলছে সে ঠিক তেমনি আছে।
যেমন ছিলে ত্রিশ বছর আগে...

এখন ত্রিশ বছর পরে তোমারে নাই মনে।
তবু আমি ঠিকই জানি সেই ভরা ষোলো তুমি
আলো করে আছো চারিধার
লাল জামা গায়ে তোমার,
আমার ছেলে বয়সের মন বলেছিল সরস্বতী।
সময় গিয়েছে চলে কত কত বছরের পার
ত্রিশ বছর তবু কই শেষ হয়! ■

মৃন্ময়ী

রাজশ্রী দত্ত

শরতের মেঘরাশি নীলাভ-সাদা শাড়ি তার সারা অঙ্গে জড়িয়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে মনের আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর সেই মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের এক চিলতে আলোর সোনালী আভা এসে পড়েছে, কুমোর পাড়ার সরু গলির সামনে এক চালা ঘরের দুয়ারে। যেদিকে তাকাবে সেদিকেই শুধু মূর্তির শোভা। দূর থেকে ভেসে আসছে ঢাকের শব্দ। ঢাকির বাদ্যের আওয়াজে মৃন্ময়ীর হাতের তুলিটা কেঁপে উঠল। তার নজর গিয়ে থমকে দাঁড়ালো পুরানো মাটির দেওয়ালে ঝুলন্ত ক্যালেন্ডারটার ওপর।

আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই পুজো, অথচ তার হাতে গড়া মায়ের প্রতিমাটি শেষ হতে এখনও বেশ কিছুটা সময় লাগবে। মৃন্ময়ীর চোখের কোণে তবুও আশার জলবিন্দু বালি কণার মতো চিকচিক করছে। সে মনে মনে মানে – মা তাকে নিরাশ করবেন না। দেবীর বোধন হওয়ার আগেই তাকে মূর্তি গড়া শেষ করতেই হবে। মৃন্ময়ী ক্যালেন্ডার থেকে চোখ সরিয়ে আবার মূর্তি গড়ার কাজে মগ্ন হয়ে যায়।

প্রসাদবাবু বাইরে থেকে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বললেন, "মানাই (মৃন্ময়ী) আজ বাকি যে চারটি ছোট মূর্তি ছিল সেগুলো একটু কম দামেই ছাড়তে হল। সবই তো বুঝিস তোর বানানো মূর্তি শুনলে কেউ আর নিতে চায় না, অগত্যা বলতে হয় অমিয়দাই অসুস্থ শরীরে মূর্তি বানাচ্ছেন, আর আমি সাহায্য করছি। কিন্তু তোর বানানো এই বড়ো মূর্তিটা আর কে কিনবে! আর তো তিনদিন বাকি!"

প্রসাদবাবু হলেন মৃন্ময়ীর প্রতিবেশী, আগাগোড়াই মৃন্ময়ীদের সব মূর্তি বিক্রির ভার তাঁর হাতেই থাকে। এত বছর রমরমিয়ে চলতো মৃণ্ময়ীদের এই পারিবারিক ব্যাবসা। কিন্তু মৃন্ময়ীর বাবা অমিয়বাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যান আগের বছর। বাড়ির সব ভার, দায়-দায়িত্ব গিয়ে পড়ে মৃন্ময়ীর ওপর। মৃন্ময়ীর বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। ছোটবেলা থেকেই রঙ তুলির সাথে মৃন্ময়ীর খেলাধুলা। তাই সেই রঙ তুলিকেই সঙ্গী করে শান্তিনিকেতন থেকে আর্ট নিয়ে পড়া শুরু করেছিল সে। বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে সেই যে তার কলকাতায় আসা, আর তারপর থমকে যায় তার জীবন এখানেই। নাহ! আর ফেরা হয়নি তার শান্তিনিকেতনে। তার শিল্পীসত্তা এখন থমকে গিয়েছে এই কুমোর পাড়ার সরু গলির ভিতরে।

প্রসাদবাবুর কথা শুনেও কোন উত্তর দিল না মৃন্ময়ী। যক্ষপুরীর মতো আঁধার ঘেরা ঘরে বসে সে নিজেকে আবার

সৃষ্টির খেয়ালে ডুবিয়ে দিল। প্রসাদবাবু কোন সদুত্তর না পেয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

আজ মহাপঞ্চমী, সব প্যান্ডেলে প্রতিমা এসে গিয়েছে। কোথাও কোথাও উদ্বোধনী সভার আয়োজন হয়েছে, চারিদিকে একেবারে সাজো সাজো রব। সারা শহর সেজে উঠেছে আলোক ঝরনায়। চারিদিকে বড়ো বড়ো বাঁশ দিয়ে প্রতিবারের মতোই ব্যারিকেড তৈরি হয়েছে। তবে বিগত কয়েকমাসে মারণ ভাইরাসের ছোবল, মানসিক ও আর্থিকভাবে সমাজের কঙ্কালসার অবয়বটাকে বড্ড বেশি করে সকলের সামনে প্রকাশ করেছে। আর্থিক অনটন প্রায় দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। আর তার সাথে মাথাচারা দিয়েছে লোভের পরিমাণ। এই কয়েকমাস মৃণ্ময়ীদের মতো সকল মৃৎ শিল্পীদের আর্থিক অনটনে কাটাতে হয়েছে। কেউ কেউ পেটের দায়ে জীবিকা পরিবর্তনেও বাধ্য হয়েছে। মৃন্ময়ীরও বেশ কষ্টে কেটেছে অসুস্থ বাবাকে নিয়ে। যাই হোক, মৃন্ময়ীর প্রতিমাটি আজ সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রতিমার মুখে এক সহনশীল মৃদু হাসি, আর চোখে এক বৈপরীত্যময় রুদ্ররূপ জ্বলজ্বল করছে। মায়ের প্রতিমার এই ভিন্নধর্মীতা ফুঁটিয়ে তোলার প্রয়াস কুমোর পাড়ায় সবার চোখে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

প্রসাদবাবু এসে বললেন, “এতো দেরীতে শেষ করলি এখন কাস্টমার পাবো কোথায়?” কিন্তু মৃন্ময়ী হাবেভাবে

বুঝিয়ে দিল যে, সে এই মূর্তিটা বেচতে নারাজ। প্রসাদবাবু কোন সুবিধা করতে না পেরে চলে গেলেন।

পরের দিন ভোরে উঠেই মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি স্নান করে তৈরি হল। আজ যে মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন করবে সে নিজের হাতে। কিন্তু এ কি আশ্চর্য! মায়ের প্রতিমা কোথায়? মৃন্ময়ী পাগলের মতো ইশারায় সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। কেউ উত্তর দিতে পারে না। সারাবেলা সে পাথরের মতো উঠানে ঠায় বসে থাকে। প্রসাদবাবু বিকালে মৃন্ময়ীর কাছে এসে একটু ইতস্তত ও কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, " জানিস মৃন্ময়ী একটা ভালো কাস্টমার পেলাম, তাই রাতেই তোর বানানো সেরা সেই মূর্তিটা বেচে দিয়েছি। ভালো টাকা দিয়েছে। এই বাজারে টাকাটাই আসল। নে তোর ভাগেরটা ধর। আর কেই বা এতো দেরীতে কিনত তোর প্রতিমা, ভাগ্যিস বিপিন বাগ রাজি হল কিনতে... ওদের অর্ডার দেওয়া মূর্তিটা ঠিক সময়ে পৌছাতে পারেনি এক কুমোর। তাই সাপে বর হল আমাদের।"

বিপিন বাগের নামটা শুনে কেঁপে উঠল মৃন্ময়ী। রক্ত বর্ণা চোখে তাকাল প্রসাদবাবু দিকে। প্রসাদবাবু একটু হকচকিয়ে গিয়ে এবার ঝাঁঝিয়ে বললেন, "রাগ দেখাচ্ছিস কি, এতো কিছুর পরেও তোর বানানো মূর্তিটা যে কিনতে রাজি হল তোর ভাগ্য খুলে গেল। এ মন্দার বাজারে কে এতোগুলো টাকা দিত?" এই বলে প্রসাদবাবু নিজের

ভাগের বেশি টাকাটা নিয়ে মনের আনন্দে গটমট করে চলে গেলেন। প্রসাদবাবু তার হাতে যে টাকাটা গুঁজে দিয়েছিলেন, তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল মৃন্ময়ী।

আজ থেকে এক বছর আগে বাবার অসুস্থতার কারণে মৃন্ময়ী কলকাতায় আসে। ভেবেছিল কিছুদিন পর তার বাবা সুস্থ হলে আবার সে হস্টেলে ফিরে যাবে। কিন্তু দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা কোনটাই বলে আসেনা। ঠিক সেইভাবেই মৃন্ময়ীর জীবনও একদিনে বদলে গেল। সেইবার তার বাবার কিছু ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরতে, মৃন্ময়ীর বেশ রাত হয়ে গেল। সকাল থেকেই সেদিন দুই বিরোধী পক্ষের বিরোধে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলোকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। তবে এ ঘটনা একদিনের নয়। কম-বেশি প্রায় রোজই কোথাও না কোথাও এমন ঘটেই থাকে। তফাৎ শুধু আজ এখানে কাল অন্য কোনোখানে। আর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যেটা হয়, তা এতই সামান্য তা জনগণের অর্থ মুণ্ডন করেই চলে যায়। যুগ যুগ ধরে সেটাই নিয়ম হয়ে গিয়েছে। বলা যায়, এ এক বিচিত্র গড্ডলিকা প্রবাহ। সেদিন সেই যৎসামান্য ক্ষয় স্বরূপ কিছু বাসকে দেওয়া হয়েছিল হোমানলে আহুতি, আর কিছু খণ্ড-অখন্ড লড়াই দিয়ে দিনের শেষে বীরেরা ক্ষান্ত হল। দিনের শেষে রাস্তাঘাট তখন প্রায় শ্মশান ভূমি, প্রায় জনপ্রানী শূন্য। মৃন্ময়ী বাস বা গাড়ি কোন কিছু না পেয়ে অগত্যা হেঁটেই ফিরছিল।

শয্যাশায়ী অমিয়বাবু অসুস্থ শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন, কিন্তু তিনি নিরুপায় ও ক্ষমতাহীন। সারারাত কেটে গেল কিন্তু মৃন্ময়ী আর বাড়ি ফিরল না। পরের দিন বেলায় যখন প্রসাদবাবু অমিয়বাবুকে এসে মৃন্ময়ীর খবর দিলেন, তখন মৃন্ময়ী শোচনীয় অবস্থায় হসপিটালের বেডে শুয়ে মৃত্যুকে হার মানাবার কঠিন লড়াই করে যাচ্ছিল। তার চোখের কাছে গভীর ক্ষত দগদগ করছিল। সারা শরীর জুড়ে অমানবিক অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। আর সব থেকে বড়ো ব্যাপারটা হলো – কিছু হিংস্র লোক নিজেদের প্রাণের ভয় কাটাবার জন্য লালসা পূরণের পর কেড়ে নিয়েছিল তার বাকশক্তিও।

মৃন্ময়ীকে বাঁচাবার জন্য যত না দরদ ছিল জনগণের তাকে নিয়ে প্রচারের ঢেউ ছিল তার অনেক গুণ বেশি। কিছু বাঁচার লড়াইটা সেই নিজেরই থাকে তাই চলে আসছে অনাদি কাল থেকে। সবাই যখন মাতববরের মতো মাতামাতি করে নিজের সততার ঘরে খিল আঁটল, মৃন্ময়ী তখন চোখ খুলে চাইল। কিন্তু তখন বিচার কই? কে বা গরীবের হয়ে বিচার চাইবে? আশেপাশের সাবধানীরা দোষ দিল, 'সবই কপাল', কেউবা বলল 'আহা! মেয়েটার জীবন শেষ', কেউবা বলল 'তার নিজের দোষে এই ভোগান্তি, একা যাওয়ার কি ছিল।' আর বিচার চাইতে এক-দু পা এগতে গেলেই মৃন্ময়ীর বাড়িতে আসত হুমকি। নীরব সীতার

পাতাল প্রবেশের মতো সেও নিজেকে বন্দি করে নিল ওই একচালা ঘরে। সঙ্গী হিসাবে পাশে ছিল শুধু তার শিল্পসত্তা।

অমিয়বাবুর ডাকে খেয়াল পড়ল। পুরানো ব্যাথাকে চোখের জলে ধুয়ে-মুছে ঘরে গেল মৃন্ময়ী। ম্রিয়মান স্বরে বলল, “বাবা, ডাকছ?”

— হ্যাঁ আজ বললি পুজো করবি মায়ের, এতো যত্ন করে মাকে সাজালি। কই পুজো কখন করবি?

ঘরে রাখা বোর্ডে চক দিয়ে লিখে, সে বাবাকে পড়তে দিল। তাতে লেখা ছিল, “পুজো হবেনা বাবা। প্রসাদকাকা আমার মাকে ওই পাপী বিপিনের কাছে বেচে দিয়েছে। আমার শেষ আশাটাও আজ নিভে গেল। বিপিনের এতো সব অত্যাচার সহ্য করেছি, কিন্তু এটা মেনে নেওয়া যায় না যে আমার মা পাপীর ঘরে পুজিত হবেন।”

— মারে একটা যে আমাদের ছোট মূর্তি আছে, ওতেই তুই মায়ের বোধন কর। মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল চারটে দিন। চারিদিকে মহা শোরগোলে। আজ বিজয়া দশমী। মৃন্ময়ী ঠিক করে মাকে বরণ করে নিজে একাই প্রতিমা নিরঞ্জন করতে যাবে গঙ্গায়। শারীরিক ক্ষত যতটা জ্বলন দেয়, তার চেয়ে মানসিক ক্ষত দেয় অধিক পীড়ন। মৃন্ময়ীর কাছে তার প্রকৃত অস্তিত্ব হল তার শিল্পসত্তায়, যা কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের লোভের কারণে বিক্রিত হয়েছে। তবু সে হারেনি

নিজের মনের কাছে, নিজের অস্তিত্বের কাছে। ওদিকে মৃন্ময়ীর বানানো সেই মূর্তিই, যা বিপিনের ক্লাবে পুজিত হয়েছে, এবারের কলকাতার পূজায় পেয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিমার সন্মান। মহা সমারোহে বেরোল বিপিনের ক্লাবের শোভাযাত্রা। গঙ্গার ধারে এলো বিপিনের ঠাকুর। মৃন্ময়ী তখন তার ছোট্ট প্রতিমাকে শেষ বিদায় জানিয়ে তেলের ড্রামে গঙ্গার জল নিয়ে গঙ্গার ঘাটের কাছে। শেষ বারের মতো সে নিজের বানানো মায়ের মুখটা দেখে দু'হাত তুলে প্রণাম করে সেখান থেকে রওনা দিল। এদিকে বিপিনের দল আর বিপিন গঙ্গার ধারে প্রতিমাকে ছয় পাক ঘুরিয়ে যেই সাতপাক শুরু করেছে, শোনা গেল হৈ হৈ কোলাহল...

পরের দিন খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো করে ছাপার অক্ষরে লেখাটা পড়ে মৃন্ময়ীর বোবা গলার আর্তনাদে ভেসে উঠল স্বস্তি ও তৃপ্তির বোবারোল। খবরের কাগজে লেখা ছিল — "এ বছরে সেরা প্রতিমার সন্মানপ্রাপ্ত ক্লাবের সভাপতি ওরফে বিশিষ্ট মন্ত্রী বিপিন বাগ গুরুতর ভাবে আহত হয়ে চির দিনের মতো বিছানায় শয্যাশায়ী হলেন। তাঁর মুক্তি ক্লাবের প্রতিমা বিসর্জনের শেষ মুহূর্তে, শেষের সাতপাক ঘোরাতে গিয়ে তাঁর দলবল টাল সামলাতে না পেরে পা পিছলে পড়ে যায়। প্রতিমা গিয়ে পড়ে বিপিনবাবুর ওপর। এরপর বিপিনবাবুকে হসপিটালে নিয়ে আসা হয়, এবং সেখানে ডাক্তাররা জানান, উনি আর

কোনদিন বিছানা থেকে উঠতে পারবেন না। যতদিন বাঁচবেন ওনাকে পঙ্গুত্ব নিয়েই বাঁচতে হবে।”

বিপিনের মতো সমাজে পঙ্গু মানসিকতার মানবরূপী অসুরের সংখ্যা অধিক। যারা ক্ষমতা ও গায়ের জোরে মৃন্ময়ীর মতো মেয়েদের সর্বনাশ করতে সদা তৎপর। আমাদের সমাজ সেই পঙ্গু মানসিকতাপূর্ণ অসুরকে ভয় বা নিজেদের সুবিধার লোভে বরণ করে আর মৃন্ময়ীর মতো মেয়েদের করুণার পাত্রী বানিয়ে বিসর্জন দেয়। এই ঘটনা অন্দর ও বাহির দু’মহলেই। এই মৃন্ময়ী বিচার পেলেও সমাজের সব মৃন্ময়ী কি সত্যি বিচার পায়? সমাজের বুকে বেড়ে ওঠা দুষ্টের কাঁটাগুলো কি সমূলে নির্মূল হয়? কিন্তু যেদিন সকল মৃন্ময়ীরা প্রকৃত চিন্ময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, সেদিন সমাজের বুক থেকে প্রকৃত অসুরদের বিনাশ হবে... ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

এলোমেলো আশ্বিন

সিদ্ধার্থ বসু

শিশির বিন্দুতে জমে আছে মননের হিসেব
নরম ঘাসের ডগায়,
অতৃপ্ত বক্ষ পাঁজরে ঝরে পড়ে শিউলি অবিরত,
শহুরে নিয়ন আলোর তলে হায়নারা দলবদ্ধ হয়।

ভস্মসাৎ হৃদি কোনে সবুজের পদধ্বনি,
ভবিতব্যের অনিশ্চিত গতিবিধি রঙ্গিন ফানুস ওড়ায়,
আদরের বাস্পে কাশফুল সিক্ত হয়,
ঠোঁট চাটা আতর তোর জন্য রাখা আছে
বেহিসেবি বাহুডোরে।
শিশির কনাও চায় পদ্ম পাতায় লেপ্টে থাকতে,
ছায়াময় কায়া লুকাবে কোন মায়াময় অন্তরে।

আদুরে মনের হিসেব পুরাতনী ছন্দে ,
সে ডাগর চোখের চাউনি যেন ভাষাহীন অন্তরালে,
রক্ত গোলাপের সৌরভ যেন বাসর রাত জাগায়,
ভালোবাসা পঙ্কিল ইঙ্গিতে লোনাজল ঝরায়,
রক্ত করবী চুপি আলাপে কহে,
আমিও গোলাপ হতে চাই...

কবিতা

একবার নিস্পলক চেয়ে দেখ
আমি আছি তোর অন্তর সুধায়।

আমি যে নির্লজ্জ হতে চাই তোর কাছে,
সব গোপন অভিসার জানবি তুই...
ফনাও তুলবি নির্বিষ আমার জন্য,
গলে পড়বে আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা।
পাহাড়ি পথে আমি খুঁজে নেবো অশ্মীভূত আখর
যেথায় বহুশতাব্দি ধরে তোর আমার
নামের আখরের জপমালা স্তব্ধ হয়েছিল ।

আয় এবারে শরৎ মেঘের মাঝে ভাসি
দিঘির ঘোলা জল থেকে তুলে আনি ১০৮ পদ্ম কুঁড়ি,
দশভুজা এসে বলে যাক মোদের ঠিকানা...
নীল রঙ্গে লিখি খোলা চিঠি লিখি অস্ফুটে,
গাঁজাখোরের ছিলিমও পিরিতির নেশা ধরায়...
বাউলের সুর যেন ডাকে আয় ছুটে আয়। ■

এমনও হয়

মঙ্গলপ্রসাদ মাইতি

[চরিত্র:- হিরন্ময় (শিক্ষক), জয়িতা (শিক্ষিকা), ভদ্রলোক, গণেশ (চাকর)]

প্রথম দৃশ্য

[বিয়ে বাড়ি। লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। বাজছে সানাইয়ের সুর। হিরন্ময় প্রবেশ করে। হাতে উপহারের প্যাকেট।]

হিরন্ময়:- এই যে দাদা শুনছেন?

ভদ্রলোক:- হ্যাঁ, বলুন।

হিরন্ময়:- কনে কোথায় – বলতে পারেন?

ভদ্রলোক:- কনে?

হিরন্ময়:- হ্যাঁ-হ্যাঁ, কনে-

ভদ্রলোক:- ঐ সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে যান। প্রথমের চারটে রুম পেরিয়ে যাবেন। পরেরটাতেই কনে আছে।

হিরন্ময়:- ধন্যবাদ।

(দোতলায় উঠে)

ভদ্রলোক বললেন – প্রথম চারটে রুম পেরিয়ে। এই একটা রুম পেরোলাম, দ্বিতীয় রুম, তৃতীয় রুম, চতুর্থ রুম, হ্যাঁ – ঐ তো পাঁচ নম্বর রুম। ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। ঐ তো

কনে বসে আছেন। কিন্তু কনের রুম এত ফাঁকা কেন? যাক, উপহারটা এখন কনের হাতে তুলে দিতে পারলেই হল। এই যে শুনুন – আমি জগৎময়ী হাইস্কুল থেকে আসছি। আমার নাম হিরন্ময় আদক। আমার ক্ষুদ্র উপহারটুকু গ্রহণ করুন।

জয়িতা:- (সবিস্ময়ে) আ-পনি!-

হিরন্ময়:- একই প্রশ্ন তো আমারও। আ-পনি!

জয়িতা:- আমি তো নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

হিরন্ময়:- ব্যাপারটা আমার কাছেও তো একইভাবে অপ্রত্যাশিত।

জয়িতা:- দাঁড়িয়ে কেন? আপনি বসুন। হ্যাঁ, এই চেয়ারটাতেই বসুন।

হিরন্ময়:- না-না, আবার বসা-টসা কেন?

জয়িতা:- বসতে অসুবিধা কোথায়? আপনি না আজ আমার বাড়ির অতিথি। প্লিজ আপনি বসুন।

হিরন্ময়:- বেশ, এই বসলাম। (চেয়ার টেনে নিয়ে বসে)

জয়িতা:- (দরজার সামনে এসে) গণেশদা, গণেশদা-ও গণেশদা-এদিকে একবার আসবে তো।

(জয়িতার ডাকে গণেশদা ছুটে এল)

গণেশ:- দিদিমণি, ডাকলে কেন? কিছু বলছ?

জয়িতা:- চট করে এই বাবুর জন্য মিষ্টি-জল নিয়ে এসো।

গণেশ:- এখনই আনছি দিদিমনি – (গণেশদা চলে গেল)

হিরন্ময়:- আপনি তো আচ্ছা, আবার মিষ্টি-জল আনতে

পাঠালেন কেন? আমি বরং নীচে যাই। অতিথিরা সব তো দেখছি নীচেই বসে আছে।

জয়িতা:- সবাই নীচে বসে আছে বলে আপনাকেও নীচে গিয়ে বসতে হবে – এর কী সত্যিই বাঁধাধরা কোনও নিয়ম আছে নাকি?

হিরন্ময়:- না, তা নেই।

জয়িতা:- তবে? শুনেছি, আপনি একটি জিনিয়াস সেই সঙ্গে ব্রিলিয়ান্ট। মাধ্যমিক থেক এম. এসসি – সবেতেই ফার্স্ট ক্লাস। অথচ সেই আপনি এমন বোকা বোকা কথা বলছেন কেন? আমি তো আপনার সঙ্গে পার্সোনাল কিছু কথা বলতেই পারি। কী পারি না?

হিরন্ময়:- অবশ্যই পারেন। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?

জয়িতা:- কী প্রশ্ন বলুন?

হিরন্ময়:- বিয়ে বাড়ি। লোকে লোকারণ্য চারদিক। নীচে দেখলাম অসম্ভব রকমের ভিড়। কিন্তু আপনি একা বসে রয়েছেন কেন? নীচের ভিড় দেখে ভেবেছিলাম কনের সামনেও না জানি কত ভিড় হবে। হয়তো এসে দেখবো আপনার সুন্দরী সুন্দরী বান্ধবীরা আপনাকে ঘিরে রয়েছে মৌচাকের মতো। কিন্তু আমার অনুমান ভুল। দেখলাম কনে ছাড়া রুমে দ্বিতীয় জন আর কেউ নেই।

জয়িতা:- (হেসে) ও! এই কথা...

হিরন্ময়:- বিয়ের দিনে কনে একা বসে থাকে – এমনটি

কিন্তু কোথাও দেখিনি। আপনার বন্ধুরা সব কোথায় গেল?

জয়িতা:- ওরা সবাই ছিল। আপনার কথায় মৌচাকের মতোই ভিড় করে ছিল। খানিকক্ষণের জন্য ওদের সব বাইরে যেতে বলেছি। এত বক বক করছিল – আমার ভালো লাগছিল না। যে মুহূর্তে আমি একা হয়েছি সেই মুহূর্তেই আপনি এলেন।

হিরন্ময়:- তাহলে তো আমি এসে ডিস্টার্ব করে দিলাম। না, আমি তবে উঠি...

জয়িতা:- না-না, আপনি উঠবেন কি! বসুন, আমার কোনো ডিস্টার্বড বোধ হচ্ছে না। আপনি এসেছেন – আমার যে কি ভালো লাগছে, বুঝিয়ে বলতে পারবো না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বিয়ে হয়ে চলে যাওয়ার আগে আপনার সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়ে গেল।

হিরন্ময়:- তাই বুঝি!

জয়িতা:- হিরন্ময়বাবু, একটা প্রশ্ন করবো আপনাকে? তার আগে একটা কথা বলি, আপনি এসে থেকে আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করে যাচ্ছেন। ভালো লাগছে না শুনতে। আপনি নিশ্চিন্তে আমাকে 'তুমি' বলতে পারেন। আমার নাম জয়িতা। ওই নামে ডাকলে আমি আরো বেশি খুশি হব।

হিরণ্ময়:- বেশ, তাই হবে। এখন কি বলতে চাইছিলে সেটা বলো।

জয়িতা:- আমাকে আপনি কনের সাজে দেখবেন, একবারও

কী ভেবেছিলেন?

হিরন্ময়:- বিশ্বাস করো, সত্যিই তা ভাবিনি। আমি ভেবেছিলাম অন্য কেউ হবে। আর তোমার কথা ভাববোই বা কেন? তোমার নামটাই তো আমার জানা ছিল না।

(গণেশদা প্রবেশ করে, হাতে মিষ্টি ও জলের প্লেট)

গণেশ:- এই যে দিদিমণি, বাবুর জন্য মিষ্টি আর জল এনেছি।

জয়িতা:- টেবিলে রাখো।

গণেশ:- এই রাখলাম। দিদিমণি, তোমরা কথা বলো। আমি ওদিকে যাচ্ছি। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে আমার।

জয়িতা:- হ্যাঁ, যাও। আর শোনো, এই বাবুর সঙ্গে আমি কিছু কথা বলছি। লক্ষ্য রেখো তো – এ সময়ে কেউ যেন আমাদের বিরক্ত করতে না আসে।

গণেশ:- তাই হবে দিদিমণি। আমি কড়া নজর রাখছি – কাউকে আসতে দেবনি।

জয়িতা:- (মিষ্টির প্লেটটা সামনে ধরে) নিন, মিষ্টিটা খান। খেতে খেতে কথা বলুন-

হিরন্ময়:- এত মিষ্টি! না-না এত খেতে পারবো না। এখন এত মিষ্টি খেয়ে নিলে ভাত খাব কী করে?

জয়িতা:- ঠিক আছে যা খাবেন খান। বাকিটা প্লেটে থেকে যাক। একি! কী দেখছেন অমন করে?

হিরন্ময়:- তোমাকেই দেখছি।

জয়িতা:- আমাকে আবার কী দেখার আছে?

হিরন্ময়:- সত্যি বলতে কি – বিয়ের সাজে অপূর্ব দেখাচ্ছে তোমাকে। যেই সাজাক তার সৌন্দর্যবোধ আছ বলতে হবে। অবশ্য না সাজালেও বিশেষ ক্ষতি হত না। তুমি এমনিতেই অপরূপা! বিয়ের সাজ সে অপরূপাকে আরো লাবণ্যময় করে তুলেছে।

জয়িতা:- হিরন্ময়বাবু, সেদিনের সেই ঘটনার কথাটা আপনার মনে পড়ে?

হিরন্ময়:- সে স্মৃতি কী ভুলবার জয়িতা? বিশেষ করে একজন পুরুষ মানুষের কাছে।

জয়িতা:- কেমন মজার না? ভাবলেই রোমাঞ্চ জাগে।

হিরন্ময়:- সেদিনের সেই ঘটনাটা আমার বুকের গভীরে ছবির ফ্রেমের মতো সাঁটা হয়ে আছে। চোখ বুজলেই মানসপটে আজও জ্বলজ্বল করে সে ছবি, সে দৃশ্য আমাকে আজও আপ্লুত করে। সেদিনটা ছিল বর্ষার এক দুপুর। শনিবার আড়াইটার মধ্যে স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। দ্রুত সাইকেলের প্যাডেল চালিয়ে বাসায় ফিরছিলাম আমি। দেখলাম পুব আকাশের দিক থেকে এক খণ্ড ঘন কালো মেঘ ধেয়ে আসছে। শেষে ভিজব কি? তাই তাড়া, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ফেরই বলতে হবে। মেঠো আলপথটুকু পেরিয়ে নদীর বাঁধের কাছে এসে যেই দাঁড়িয়েছি – মেঘটা যেন আছড়ে পড়ল। অন্ধকারে ঢেকে গেল দুপুরের পৃথিবী। সূর্য মুখ লুকালো মেঘের আড়ালে। নদীঘাটে এসে দেখি আর

এক বিপত্তি। নৌকা ওপারে। মাঝির নেই পাত্তা। সামনেই একটা ঘন বাঁশঝাড়। তার তলায় গিয়ে সাইকেলটা রেখে আমি নিজেও দাঁড়ালাম। সামনেও কোন লোকালয় ছিল না যে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেব। ব্যাগ থেকে ছাতাটা বের করলাম। আর কিছু না হোক মাথাটা তো অন্তত বাঁচবে – এই ভেবে বাম দিকে যেই তাকিয়েছি, তখনই দেখি অদূরে দাঁড়িয়ে আছো তুমি। মেঘের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ। অন্তত তোমার চোখে-মুখের চেহারাই সেকথা জানান দিচ্ছিল।

জয়িতা:- বেশি সময় গেল না – বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। এক ফোঁটা – দু' ফোঁটা করে। সঙ্গে বয়ে গেল এক ঝলক হিমেল বাতাস। একটু পরেই বৃষ্টিটা যে ঝেঁপে আসবে তারই লক্ষণ ঠিক সেইসময় আপনি আমাকে...

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে মেঘের ডাক। জোরে বাতাস বইছে তারও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে)

হিরন্ময়:- এই যে শুনছেন, বৃষ্টিতে ভিজবেন কেন? আপনি আমার ছাতাটা নিন না।

জয়িতা:- আমার মাথায় ছাতাটা এলে কী আপনার মাথাটা বাঁচবে?

হিরন্ময়:- না, তা বাঁচবে না। তবে আমি ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে থাকবো, আর আপনি চোখের সামনে ভিজবেন সেটা কী ভালো দেখাবে না শোভনীয় হবে? আপনার মাথায় তো দেখছি একরাশ লম্বা-ঘন চুল। ভিজলে জ্বর-সর্দি তো হতেই পারে। তাতে আপনার কষ্ট যেমন – তেমনই কষ্ট বাড়ির লোকেরও সেটা কী খুব সুখের কথা?

জয়িতা:- (সামনে এসে) দেখুন, পুরো ছাতাটাই যদি আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিই সেটাও তো বড়ো স্বার্থপরের কাজ হবে। তার চেয়ে এটা করলে ভালো হয় না?

হিরন্ময়:- কী বলুন?

জয়িতা:- একই ছাতার তলায় দুজনে দাঁড়াই। আমার মাথা বাঁচল – আপনারও। আপনিও খানিক ভিজলেন – আমিও খানিক। তাতে সবকিছু শেয়ার করে নেওয়া হল।

হিরন্ময়:- প্রস্তাবটা অবশ্য মন্দ বলেননি। বেশ সেটাই না হয় হোক। এখন মিছিমিছি না ভিজে ছাতার তলে আসুন তো।

জয়িতা:- এই এলাম আপনার ছাতার তলে।

হিরন্ময়:- এবার ভালো করে দাঁড়ান। না-না, লজ্জা করবেন না। দেখছেন তো কি তোড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। যতটা সম্ভব বৃষ্টির ছাট থেকে নিজেদের বাঁচানো – সেই চেষ্টাই করতে হবে আমাদের।

জয়িতা:- উ: বাতাসটা কি ঠাণ্ডা! আমার গা’ তো শিরশির করছে।

হিরন্ময়:- কোত্থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন আপনি?

জয়িতা:- আমি বাড়ি ফিরছি। থাকি আরামবাগে।

হিরন্ময়:- আরামবাগে! ওখানে কিছু করেন বুঝি?

জয়িতা:- ওখানকার কলেজে পড়ি। হস্টেলে থাকি। মাঝে-মধ্যে গ্রামে আসি। আর আপনি? আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না।

হিরন্ময়:- আমি জগৎময়ী হাইস্কুলের শিক্ষক। দু'মাসের মতো হল জয়েন করেছি।

জয়িতা:- ও, তাই নাকি! তাহলে তো আপনাকে একটা নমস্কার করতেই হয়। দেখছেন কেমন আমি, সামান্য সৌজন্যবোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। প্লিজ কিছু মনে করবেন না, নমস্কার...

(নমস্কার করার জন্য জয়িতা যেই হাত তুলেছে অমনি প্রচণ্ড শব্দে সামনে বাজ পড়ে। থর থর করে কেঁপে উঠে ভূপৃষ্ঠ। জয়িতা ভয় পেয়ে 'উ: মাগো' বলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হিরন্ময়কে জড়িয়ে ধরে)

জয়িতা:- উ: মাগো...

(বেশ কিছুক্ষণ জয়িতা হিরন্ময়ের বুকে মাথা রাখে। এতটাই ভয় পেয়েছিল জয়িতা যে বাজের শব্দ মিলিয়ে যাবার পরেও হিরন্ময়ের বুক থেকে সে মাথা তোলে না।)

হিরন্ময়:- আ:, একি করছেন। আমাকে ছাড়ুন...

জয়িতা:- সরি, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে কিছু করবেন না। আমার ব্যাগ?

হিরন্ময়:- এই যে নীচে পড়ে গেছে। (কুড়িয়ে) এই নিন।

জয়িতা:- ধন্যবাদ।

দৃশ্যান্তর। পূর্বের দৃশ্য ফিরে আসে

তৃতীয় দৃশ্য

জয়িতা:- কী চুপচাপ বসে আছেন যে? এত কী ভাবছেন? সেদিনের ঘটনাটা বুঝি?

হিরন্ময়:- ঠিকই ধরেছ জয়িতা। আমি এতক্ষণ হারিয়ে গিয়েছিলাম। মনে পড়ে জয়িতা ব্যাগটা কুড়িয়ে দেবার পর তুমি সেই যে ধন্যবাদ জানিয়ে সরে গেলে আর একটিও কথা বললে না। বৃষ্টির মধ্যেই খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে রইলে মাথা নীচু করে। অনেকটা অপরাধীর মতন। এর অল্পক্ষণ পরেই বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। পুব আকাশ হয়ে গেল ঝকঝকে ফর্সা আগের মতোই। সূর্য মেলে দিল তার সোনালি ডানা। বৃষ্টিস্নাত গাছগাছালিগুলোকে দেখাচ্ছিল অদ্ভুত রকমের সবুজে সবুজ। কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকার মাঝিও এসে গিয়েছিল। একই নৌকাতে পার হলাম দুজনে। কিন্তু কেউ আর কোনো কথা বললাম না। দেখলাম তুমি একেবারে চুপচাপ শান্ত হয়ে গেছ। নৌকা

থেকে নেমে বাঁধের উপরে উঠলাম। বাঁধের খানিক পরেই দুদিকে দুটো পথ চলে গেছে। আমি চললাম একদিকে আর তুমি ধরলে অন্যপথ।

জয়িতা:- ঘটনাপ্রবাহ এমনই, জীবনের ঘাত-অভিঘাত এমনই – তারপর দু'বছরের মধ্যে একবারও আর দেখা-সাক্ষাৎ হল না সেই ছেলে মেয়েটির মধ্যে। দেখা হল আজ। বিয়ে বাড়িতে। একজন বিয়ের কনের সাজে সজ্জিতা, অন্যজন এসেছে তারই বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

হিরন্ময়:- ছেলেটি এতদিন মেয়ের নাম পর্যন্ত জানত না। আজই জানল তার নাম জয়িতা। (দুজনেই হেসে উঠল)

জয়িতা:- আচ্ছা হিরন্ময়বাবু, এই দু'বছরের মধ্যে আমার কথা আপনার মনে পড়েনি?

হিরন্ময়:- গোপন করবো না। প্রায় সময়ই মনে পড়েছে তোমার কথা। তোমার সেই ছোঁয়া, দুরু দুরু বুকের কাঁপন, সেই স্পর্শানুভূতি – কত সময় আমাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। প্রকৃতিকে ধন্যবাদ জানাই-প্রকৃতি সেদিন আমাদের কত কাছে এনে দিয়েছিল। না চাইলেও একে অন্যের শরীর সেদিন কত সুন্দরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল। বাজ পড়ার পর তুমি যা করেছিলে – একান্ত আশ্রয়স্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিলে আমার বুকের তল। সে সব কী ভোলা যায় জয়িতা? তোমাকে আর একটিবার দেখার জন্য মনটা কেবলই ছটপট করেছে।

জয়িতা:- তাহলে আমার খোঁজ আপনি করলেন না কেন? আমি তো এমন কোনো দূরে চলে যাইনি যে দেখা মিলত না।
হিরন্ময়:- আসলে আমার পৌরুষ আমাকে বাধা দিয়েছিল। একটা মেয়ের জন্য পাগলামি করে বেড়াব – এটা আমি চাইনি। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ এসে আমাকে গ্রাস করেছিল। আমার কথা তো বললাম – এবার তোমার ভাবনার কথা বলো।
জয়িতা:- মিথ্যে বলবো না। আমি কিন্তু সত্যি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আর আজও সে ভালোবাসা জমা রয়েছে বুকের এক কোণে।
হিরন্ময়:- তাহলে তুমি কেন জানালে না তোমার মনের কথা। তুমি তো জানতে আমি তোমাদেরই জগৎময়ী হাইস্কুলের একজন টিচার। ইচ্ছে করলেই তো আমার সাথে দেখা করা যেত।
জয়িতা:- প্রথমত আমি আপনার সামনে দাঁড়াতে পারিনি লজ্জায়। সেদিন ওভাবে আপনার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়াটা আমার মোটেই ভালো কাজ হয়নি। আর দ্বিতীয় কারণ হল – আমি চিরকালই জেদি, একগুঁয়ে একরোখা মেয়ে। একবার যে জেদ মাথায় চেপে বসে তার থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারি না চট করে। আমি ভেবেছিলাম আমার জন্য আপনার যদি সামান্য কষ্টবোধ হয় কিংবা আকর্ষণ থেকে থাকে তবে আপনি আগে যেন আমার সঙ্গে

দেখা করেন। আপনি বললেন না – আপনার পৌরুষ আপনাকে আমার কাছে আসতে দেয়নি। তেমনই আমার নারীত্ব একই কারণে আমাকে আপনার কাছে যেতে দেয়নি। আমার নারীত্ব কী এতই ফ্যালনার নাকি সহজলভ্য যে আপনার কাছে আমাকে হ্যাংলার মতো ছুটে যেতে হবে?

হিরন্ময়:- হুঁ, বেশ বোঝা গেল। আমাদের এতদিন দেখা না হওয়ার পিছনে আমরা দুজনেই সমান দায়ী। জানো জয়িতা, আজ না আমার একজনের প্রতি খুব হিংসে হচ্ছে।

জয়িতা:- হিংসে! কার প্রতি?

হিরন্ময়:- তোমার হবু স্বামীর প্রতি।

জয়িতা:- কেন?

হিরন্ময়:- তোমার মতো দামি কন্যারত্ন – সুদর্শনাটিকে একান্ত আপনার করে পাচ্ছে বলে। ইচ্ছে করলে আমিও তো তোমাকে পেতে পারতাম।

জয়িতা:- ও কথা বলবেন না হিরন্ময়বাবু। যা হয়নি তা নিয়ে আর ভেবে কি লাভ বলুন? এতে কষ্টটাই তো বাড়বে।

হিরন্ময়:- আপনার হবু স্বামী কী করেন? নিশ্চয়ই খুব সুপুরুষ – সেই সঙ্গে সুশিক্ষিত?

জয়িতা:- সুপুরুষ কিনা বলতে পারবো না। কারণ এখনো তো চোখে দেখিনি। তবে সুশিক্ষিত মোটেই নয়। শুনেছি ক্লাস এইট অব্দি নাকি পড়াশোনা করেছে। কি সব ব্যবসা করে। শিক্ষার জোর না থাকলেও টাকার জোর আছে।

হিরন্ময়:- তুমি মেনে নিলে? প্রতিবাদ করনি?

জয়িতা:- আমাদের সমাজে মেয়েরা যা চায় তা কি সবসময় পায় হিরন্ময়বাবু?

হিরন্ময়:- এই মুহূর্তে আমার কী ইচ্ছে হচ্ছে জানো জয়িতা?

জয়িতা:- কী?

হিরন্ময়:- এখনই একটা ভূমিকম্প হয়ে যেত, কিংবা নিদেনপক্ষে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কিছু। বর আসতে পারল না। এদিকে লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। তুমি লগ্নভ্রষ্টা হতে চলেছো। তোমার বাড়ির লোকজন-আত্মীয়-স্বজন সবাই উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় আকুল – কী হবে মেয়ের? আমি তখনই বীরের বেশে নায়কের সাজে এগিয়ে গিয়ে বলতাম – ভয় কী আপনাদের? আমি তো আছি। এই আমি আপনাদের মেয়েকে গ্রহণ করলাম। এমনটা হলে কেমন মজা হত তাই না?

জয়িতা:- (হেসে) আপনি আমার অমঙ্গল চাইছেন? কিন্তু হিরন্ময়বাবু, ভালোবাসা তো কারুর ক্ষতি চায় না।

হিরন্ময়:- অপরাধ নিও না জয়িতা। আমি ওভাবে বলতে চাইনি। আমি সত্যিই স্বার্থপরের মতো কথাটা বলে ফেলেছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো জয়িতা। এমনভাবে আঘাত পাবে জানলে আমি কখনোই ওকথা বলতাম না।

জয়িতা:- হিরন্ময়বাবু...

(জয়িতা কিছু বলতে চাইছিল তা আর হল না। তার আগেই সারা বাড়িময় শোরগোল পড়ে গেল ‘বর এসেছে, বর এসেছে। শুনতে পাওয়া গেল কে যেন চিৎকার করে বলছে –“ওরে সব কোথায় গেলি রে – বর এসেছে, শাঁখ বাজা, উলুধ্বনি দে’। মুহূর্তের মধ্যে শাঁখের আওয়াজ আর উলুধ্বনিতে গোটা বিয়েবাড়ি মুখর হয়ে উঠল। লোকজনের ছোটাছুটি, ব্যস্ততা, চেঁচামেচি আর হট্টগোল কয়েকগুণ বেড়ে গেল।)

হিরন্ময়:- ঐ বর এসেছে। আমি আসি জয়িতা।

জয়িতা:- খেয়ে যাবেন কিন্তু।

হিরন্ময়:- জয়িতা, আর আমাদের মধ্যে কোনোদিন কী দেখা হবে না?

জয়িতা:- হিরন্ময়বাবু, জীবনটা নদীর স্রোতের মতন। কখন কিভাবে মোড় নেয় আগাম তা কেউ বলতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছা থাকলে হয়তো আবার কোনোদিন আমাদের দু’জনের মধ্যে দেখা হলেও হতে পারে।

হিরন্ময়:- আমি কিন্তু অপেক্ষা করে থাকবো।

জয়িতা:- পাগল আর কাকে বলে!

(হিরন্ময় চলে যায়)

চতুর্থ দৃশ্য

দশ বছর পরের একদিনের ঘটনা

নাটক

(দেখা যায় একটি বাসস্ট্যান্ড। একটা বাস এসে দাঁড়ায় হর্ন দিতে দিতে। বাসটাতে প্রচণ্ড ভিড়। হিরন্ময় সামনের দরজা দিয়ে নামে ভিড় ঠেলে। পিছনের দরজায় নামে জয়িতা)

জয়িতা:- (যাত্রীদের উদ্দেশ্যে) আ:, কী করছেন? সামনেটা ছাড়ুন। নামতে দিন আগে।
হিরন্ময়:- (থমকে দাঁড়িয়ে) একি! এ কার কণ্ঠস্বর শুনলাম? এ কণ্ঠস্বর তো আমার খুব চেনা, অতি পরিচিত। এ কণ্ঠস্বর তো এর আগে আমি শুনেছি কোথাও। ভদ্রমহিলা কে তা আমাকে দেখতেই হচ্ছে। একি! জয়িতা না! সেই চুল...
সেই নাক-সেই মুখ! কিন্তু নিরাভরণ দেহ কেন? হাতে শাঁখা কই? সিঁথিতে সিঁদুর কোথায়? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। তবে ভদ্রমহিলা কী জয়িতা নন? সে চিনতে ভুল করছে। ভদ্রমহিলা পিছন ফিরলেন দেখছি। ওইতো ভদ্রমহিলার ঘাড়ের কাছে একটা জড়ুলের দাগ। এ দাগ তো জয়িতারও ছিল। নদীঘাটে সেদিন বাজ পড়ার সময় ভয়ে যখন জয়িতা আমার বুকে মুখ ঢেকেছিল সেদিন তো আমি স্পষ্ট দেখেছিলআম ওই দাগ। যা তার ব্লাউজে ঢাকা পড়েনি। জয়িতাই যদি হয় তবে এ বেশ কেন? আচ্ছা, জিজ্ঞেস করেই দেখা যাক না – এই যে শুনছেন...
জয়িতা:- আমাকে বলছেন? আরে হিরন্ময়বাবু, আপনি! বাব্বা, কতদিন পরে দেখা হল।

হিরন্ময়:- তা দীর্ঘ দশ বছর পরে দেখা। আমি ভাবতেই পারছি না, আজ পথের মাঝে এমনি করে হঠাৎ তোমার সাথে দেখা হয়ে যাবে। (স্বগত) বাইরের পোশাকটাই কেবল পাল্টেছে জয়িতার। কিন্তু সেই অনবদ্য রূপ আর অনুপম সৌন্দর্যের এতটুকু ঘাটতি হয়নি। বরং সামান্য বয়সের ভার তাকে আরও উজ্জ্বল ও সুন্দরতর করে তুলেছে। আসল সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য বুঝি এখানেই – স্বাভাবিক পরিবেশেই তার পরিপূর্ণ দিকটির প্রকাশ ঘটে।

জয়িতা:- কী দেখছেন অমন হাঁ করে?

হিরন্ময়:- না মানে, তোমার এ বেশ...

জয়িতা:- আমার কপাল পুড়েছে হিরন্ময়বাবু। স্বামীসুখ ভাগ্যে সইল না।

হিরন্ময়:- ঘটনাটা বলবে কী?

জয়িতা:- চলুন, শান বাঁধানো ঐ বটগাছটার তলায় গিয়ে বসি। ওখানেই না হয় সব বলবো। যা গরম না। ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছি।

হিরন্ময়:- বেশ চলো, বটগাছের শীতল ছায়ায় বসেই না হয় শুনবো তোমার কথা।

জয়িতা:- হ্যাঁ, চলুন...

(দুজনেই সামনে এক বট গাছের তলায় গিয়ে বসে)

হিরন্ময়:- আ:, এই বসলাম। হ্যাঁ, এবার বলো। ওহো-সত্যি তোমার খুব ঘাম হয়েছে। ঘামটা মোছ আগে।

জয়িতা:- রুমালটা কোথায় রাখলাম। হ্যাঁ, এই ব্যাগেই আছে। (রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে) বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটে যায় হিরন্ময়বাবু। প্রচণ্ড ড্রিঙ্ক করতো আমার স্বামী। কোনো কোনো দিন একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ত। পার্টিতে যাওয়ার অভ্যেস ছিল তো। একদিন এমনই এক পার্টিতে আমরা গেছি দুজনেই। আমার যাওয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। আমার স্বামীই আমাকে জোর করে নিয়ে যায়। সেদিনও নেশা করেছিল। নেশার ঘোরেই গাড়ি চালিয়ে আসছিল। অসম্ভব গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল গাড়ির। যত বলি আস্তে চালাও – সেকথা কানেই নেয় না। গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। যেন মৃত্যুর নেশা পেয়ে বসেছিল মানুষটাকে। তারপর যা হবার তাই হল। রাস্তার পাশেই বিরাট এক গাছে গিয়ে গাড়ি মারল ধাক্কা। গাড়িটা রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ল গভীর খাদে। এরপর আর কিছু মনে ছিলনা আমার। যখন জ্ঞান ফিরল – তখন দেখি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি আমি। হেথায়-হোথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। স্যালাইনের বোতল ঝুলছে। অসম্ভব ব্যথা সারা শরীরে। হাসপাতালে ক'দিন থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। দেখলাম স্বামী আমার আগেই ছবি হয়ে গেছে। আমারও বাঁচার কথা নয়। কিভাবে বেঁচে উঠেছি তা জানি না। (চোখ মোছে জয়িতা)

হিরন্ময়:- ও:, ভেরি স্যাড! তোমার কোনো ছেলেমেয়ে –

জয়িতা:- এখানেও আমার কপাল মন্দ হিরন্ময়বাবু। সন্তান আমরা দুজনেই চেয়েছিলাম। কিন্তু সন্তান আসছিল না। ডাক্তারি পরীক্ষার পর ধরা পড়ল আমার স্বামী কোনোদিন সন্তানের পিতা হতে পারবে না।

হিরন্ময়:- এত বড়ো সর্বনাশ তোমার জীবনে নেমে আসবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। দুর্ভাগ্য তোমাকে আজ কোন জায়গায় টেনে নিয়ে এসেছে। এখন তাহলে থাকো কোথায়? কী করো?

জয়িতা:- এখন একটা গার্লস স্কুলে পড়াই। বিদ্যা-বুদ্ধি তো সামান্য ছিলই। খেটে-খুটে এস. এস. সিটা দিয়েছিলাম। প্রথম বারেই লেগে গেল। অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে আমার ভালো লাগেনি।

হিরন্ময়:- খুব ভালো করেছো জয়িতা। এই ব্যাপারে তোমার স্বাধীন চিন্তা-চেতনা আর আত্মমর্যাদাবোধকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। লড়াইয়ের ময়দান থেকে তুমি যে পালিয়ে যাও নি এটা আমাকে সত্যিই আনন্দ দিচ্ছে।

জয়িতা:- এই দেখুন, এতক্ষণ ধরে শুধু আমার কথাই বলে যাচ্ছি। আপনার কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি। তা কেমন আছেন আপনি? এদিকে কোথাও এসেছিলেন বুঝি?

হিরন্ময়:- আমি তো এখন এখানেই থাকি। এই মেদিনীপুর শহরেই বিধাননগরে।

জয়িতা:- তাই বুঝি? আপনার সেই জগৎময়ী হাইস্কুল –

হিরন্ময়:- সে তো কবেই ছেড়ে এসছি। তোমার বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই। নেট-এ বসেছিলাম। পাশও করলাম। এখন তো আমি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই।

জয়িতা:- ও, আপনি তো তাহলে এখন আরো অনেক বড়ো হয়ে উঠেছেন। অধ্যাপক হয়েছেন। অবশ্য আপনার মতো জিনিয়াস ছাত্রের এমনটাই হওয়া উচিত ছিল। তা বিয়ে-থা করেছেন? বৌ কেমন হয়েছে? খুব সোহাগ করে বুঝি? নাকি জ্বালায়?

হিরন্ময়:- যে মানুষটা বিয়েই করল না তার আবার বৌ আসে কোত্থেকে? জ্বালা-সোহাগের প্রশ্নই উঠে না।

জয়িতা:- কী বলছেন আপনি হিরন্ময়বাবু!

হিরন্ময়:- কথাটা শুনে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে পড়লে তুমি জয়িতা!

জয়িতা:- অবাক হব না? এমন একটা কথা শুনবো, এতো অস্বাভাবিক না? নিজের কানকেই তো বিশ্বাস করতে পারছি না। তা কেন - বিয়ে করলেন না কেন? আপনার মতো মানুষের তো মেয়ের অভাব হবার কথা নয়!

হিরন্ময়:- না, মেয়ের অভাব হয়তো আমার হত না। কিন্তু যাকে ভালোবাসলাম তাকেই যখন কাছে পেলাম না – তখন আর বিয়ের কথা ভেবে লাভ কী? নতুন করে কাউকে যে আর ভালোবাসবো - মনের দিক থেকে সায় পেলাম না।

এখন একা দিব্যি আছি-বেশ আছি। গবেষণা-পড়াশোনা নিয়ে আমার সময় কেটে যাচ্ছে।

জয়িতা:- হিরন্ময়বাবু, এতদিন জানতাম আমার বুকেই বুঝি জমে আছে ব্যথার পাহাড়, কষ্টের নদী। এখন বুঝলাম আপনিও কম দু:খী নন। একই বেদনার যাত্রী আপনিও। তবে কী বলবো জানেন?

হিরন্ময়:- কী?

জয়িতা:- আপনি দু:খবিলাসী। এই দু:খ আপনি নিজের থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর বয়েও বেড়াচ্ছেন।

হিরন্ময়:- বা:, কথাটা তুমি বেশ বলেছ আমি দু:খবিলাসী।

জয়িতা:- এছাড়া আর কী বিশেষণে আপনাকে চিহ্নিত করতে পারি বলুন? কী প্রয়োজন ছিল আপনার একটা মেয়ের জন্য এভাবে ব্রহ্মচারী সেজে বসে থাকার? ভবিষ্যৎকে এভাবে জলাঞ্জলি দেবার?

হিরন্ময়:- আমায় তুমি দোষ দিচ্ছ?

জয়িতা:- দোষ দেব কেন আপনাকে? আপনি যা ভালো বুঝেছেন করেছেন। তবে এটাও ঠিক কেন জানিনা আপনার প্রতি আগে থেকেই একটা শ্রদ্ধা ছিল, সেই শ্রদ্ধা বিনয় আরো শতগুণে বেড়ে গেল। থাক ওসব কথা। হিরন্ময়বাবু, কোনও রবিবার বা ছুটির দিন দেখে একদিন আমার বাসায় আসুন না।

হিরন্ময়:- কোথায় থাকো তুমি?

জয়িতা:- আমি তো থাকি শরৎপল্লিতে। একাই থাকি। কাজের একটি মেয়ে রেখেছি। মাঝে-মধ্যে এসে কিছু কাজ করে দিয়ে যায়। এই নিন ঠিকানা।

(ছোট্ট একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিল জয়িতা)

হিরন্ময়:- সত্যিকারের অন্তরের ডাক ডাকছ তো?

জয়িতা:- অন্তরের না বাইরের এ ডাক – একবার আমার বাসায় এসেই দেখুন না। আপ্যায়নের ত্রুটি হয়ে থাকলে কিংবা খারাপ ব্যবহার পেলে কোনোদিন না হয় আমার সীমানায় পা রাখবেন না। সে অধিকার তো আপনার আছে, কেড়ে তো নিচ্ছি না।

হিরন্ময়:- যাব জয়িতা-অবশ্যই যাব তোমার কাছে। একবার কেন – প্রয়োজনে বারবারও যেতে পারি। আজ থেকে আমি না হয় তোমার বন্ধু হলাম। হাতটা বাড়াও জয়িতা।

জয়িতা:- হিরন্ময়বাবু, আপনি আমায় আজও এত ভালোবাসেন?

(হাতটা বাড়িয়ে দেয় জয়িতা)

হিরন্ময়:- জানি না।

(হিরন্ময় পরম বিশ্বাসে, সুগভীর আস্থায় জয়িতার হাতে হাত রাখে। আবহ সঙ্গীতে বেজে ওঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর - 'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।/পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর, সুন্দর হে সুন্দর।।')... ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/
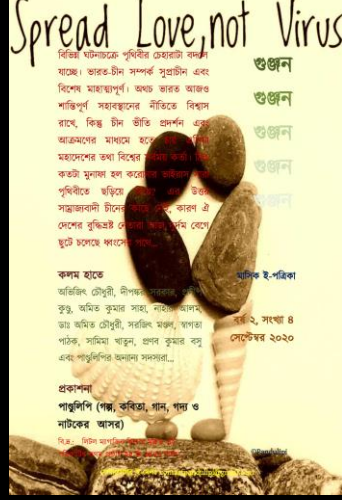
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**